জলধর সেন

১৮৬০—১৯৩৯

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

পাণ্ডুলিপি : গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

মুদ্রণ : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ দেড় মার্কিন ডলার

JIBANI GRANTHAMALA : A series of literary biographies

Tribute to the Martyrs of the Language Movement 1952

প্রসঙ্গ-কথা

সামসময়িক চৈতন্যকে বিস্তৃততর, প্রাগ্রসর, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-সঞ্চারী ও মানবিক করতে হলে, আমাদের ঐতিহ্য ও জাতি-সত্তামূলে সংযুক্ত হওয়া অনিবার্য; কেননা সাহিত্যিক ও মননশীল সম্প্রদায়ই কোনো জাতির চেতনালোকের শীর্ষপ্রান্ত, এবং তাঁরাই ঐতিহ্যের শতমূল, শক্তি-উৎসের পাললিক মৃত্তিকা। সুতরাং, শুধু বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রশ্নেই নয়, জাতি-সত্তা গঠনের উপাদান হিসেবেও, সাধারণ পাঠকের জন্য 'জীবনী-গ্রন্থমালা' শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্ব যেমন অপরিহার্য, তেমনি এর দ্রুততর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। এ-প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজ পরিণত হয়েছে সুপ্রমাণিত ও সক্রিয় এক আদর্শে, বিশ্বাসে। সত্তা-পরিচয়-সন্ধানী জাতিকে এ তথ্য জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত যে, গত তিন বছরে তিরানব্বই জন সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের জীবনী-গ্রন্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতেও ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন আরো ছত্রিশ জন সাহিত্যিকের জীবন-কথা।

সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদক, সংগ্রাহক, ভ্রমণ-উৎসাহী ও কথাশিল্পী জলধর সেন ছিলেন সামসময়িককালে সম্মানিত ও স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। তিনি দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থাবলী, উপন্যাস ও গল্পসমূহ বাংলা সাহিত্যে অন্তরঙ্গ এক ভিন্ন স্বাদের সংযোজন। জলধর সেনের সম্পাদিত 'হরিনাথ-গ্রন্থাবলী' ও 'প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী' তাঁর ঐতিহ্যসচেতন গবেষক মনের পরিচায়ক।

শিক্ষাবিদ ও গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী, বর্তমান গ্রন্থে নিরলস সারস্বত-সাধক জলধর সেনের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

জীবনী-গ্রন্থমালা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

মাহমুদ শাহ কোরেশী
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচী

জীবন-কথা	৯
কর্ম জীবন	২৮
চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য	৩১
অভিনন্দন-পত্র	৪৬
শেষজীবন ও মৃত্যু	৫০
লেখক-জীবন ও গ্রন্থ-পরিচিতি	৫২
গ্রন্থ-পরিচিতি	৬৩
সমকালীন প্রতিক্রিয়া	৯৭
রচনা-নির্দর্শন	১০৪
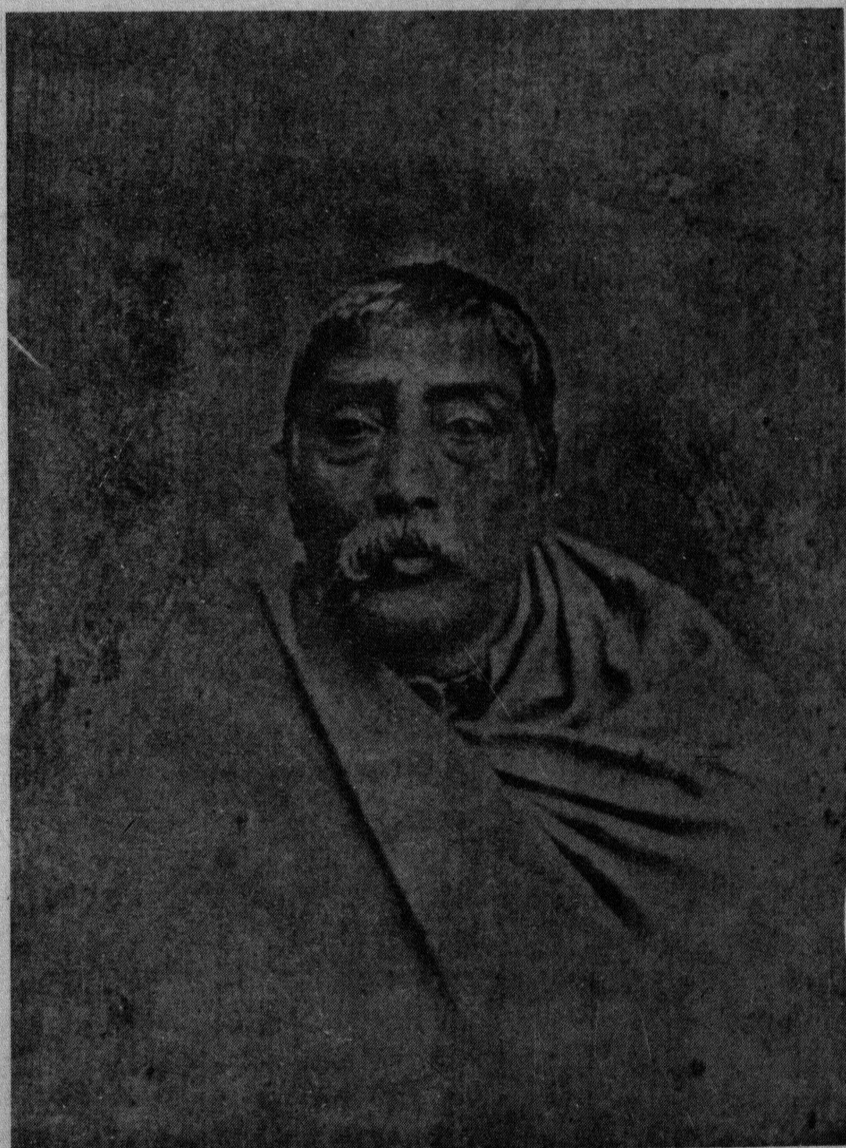
জলধর সেন

জীবন-কথা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে জন্মগ্রহণ করে গদ্যসাহিত্যের চর্চায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, জলধর সেন (১৮৬০—১৯৩৯) তাঁদের অন্যতম। আজ তাঁর নাম সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এককালে তিনি কথাশিল্পী, ভ্রমণকাহিনীকার, জীবনচরিত লেখক, সাময়িক-পত্রের সম্পাদক ও তরুণ লেখকদের পৃষ্ঠপোষকরূপে বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এককালের খ্যাতিমান এই সব্যসাচী শিল্পী-ব্যক্তিত্ব আজ প্রায়-বিস্মৃত একটি নাম। প্রকাশক বা পাঠক বা সমালোচক—সকলের আনুকূল্য থেকেই আজ তিনি বঞ্চিত। আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক প্রেক্ষা-পটের পরিবর্তন, রুচির পালাবদল ও শিল্পবোধের রূপান্তর—এ-সব বক্তব্য মান্য করেও এ-কথা বলা যায়, উত্তরকালের এতোখানি ঔদাসীন্য ও অমনোযোগ হয়তো তাঁর প্রাপ্য ছিলো না।

পরিবেশ-পটভূমি

জলধর সেনের জন্ম এমন এক অঞ্চলে, যার প্রসিদ্ধি ও প্রাচীনত্ব সুবিদিত।[১] এই জনপদ, কুমারখালী, বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার একটি শ্রীহীন ক্ষুদ্র উপজেলা হিসেবে পরিচিত হলেও একসময়ে তার জাঁক ও মর্যাদা ছিলো উল্লেখ করার মতো। প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের কারণে কুমারখালীর আবস্থান ও মর্যাদা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। থানা থেকে মহকুমায় উন্নীত হয়ে কুমারখালীকে আবারও থানায় পরিণত হতে হয়। ইংরেজ-শাসনের পূর্বে কুমারখালী-অঞ্চল ফরিদপুর ও যশোরের অন্তর্গত ছিলো। পরবর্তীকালে থানা কিংবা মহকুমা হিসেবে কুমারখালী যথাক্রমে রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া ও সবশেষে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলার অধীনে কুমারখালী, খোক্‌সা, পাংসা ও বালিয়াকান্দী থানা নিয়ে কুমারখালী মহকুমার জন্ম। কিন্তু ১৮৭১ সালে

নদীয়া জেলাধীন কুষ্টিয়া মহকুমার সামিল হয়ে কুমারখালী তার মহকুমার মর্যাদা হারিয়ে পুনরায় থানায় পরিণত হয়। কুমারখালী একসময় নাটোর-রাজের অধীনে ছিলো। পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

নদী-বন্দর ও ব্যবসায়-কেন্দ্র হিসেবে কুমারখালীর প্রসিদ্ধি বহু পূর্বের। নবাবী আমলে এখানে একটি কাছারি ছিলো এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে এখানে কোম্পানীর নীল ও রেশমকুঠি স্থাপিত হয়। এই কুমারখালীতেই ছিলো ৫১ টি নীলকুঠির হেড অফিস। এই অঞ্চলের অত্যাচারিত নীলচাষী তীব্র প্রতিবাদ প্রতিরোধে কীভাবে জ্বলে উঠেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২) রচিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়। কুমারখালী কোম্পানীর একটি প্রধান রেশম-কেন্দ্র ছিলো এবং এই রেশম-কুঠি পরিচালনার জন্য এখানে একজন ইংরেজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্স বাস করতেন। নীল ও রেশমের ব্যবসায়-সূত্রে এখানে ছোটখাট ইংরেজ বসতিও গড়ে ওঠে। কুমারখালী রেল স্টেশন-সংলগ্ন আঠারো শতকের শেষার্ধে প্রতিষ্ঠিত খ্রীস্টান গোরস্থান এখনো সেই স্মৃতি বহন করছে। একসময় কলকাতায় ইংরেজ রমণীদের কাছে 'Commercolly Feathers' নামে হাড়গিলা পাখির পালকের বিশেষ চাহিদা ও সমাদর ছিলো। কুমারখালীর হাট ছিলো দেশের তাঁতবস্ত্রের বৃহত্তম হাট। নদীয়ার 'ম্যাঞ্চেস্টার' নামে খ্যাত কুমারখালীর তাঁতের কাপড় ও রেশমের খ্যাতি বিলাতের বাজার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রেল-যোগাযোগ স্থাপিত হলে কুমারখালীর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি কুমারখালীর শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যও উল্লেখযোগ্য। নবাবী আমল থেকেই এখানে টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-পাঠশালা ছিলো। ইংরেজ আমলে চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ, সীতানাথ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতের টোলের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিলো। ইংরেজ আমলে এই দূর-মফস্বলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সি. ই. ট্রেভেলিয়ান তাঁর ১৮৩৮ সালের শিক্ষা-সম্পর্কিত রিপোর্টে কুমারখালী অঞ্চলের বালকদের শিক্ষার প্রতি প্রবল উৎসাহ ও অনুরাগের এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য উনিশ শতকের চারের দশকেই স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যবসায়ী মথুরানাথ কুণ্ডুর আন্তরিক

চেষ্টায় কুমারখালীতে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এম. এন. হাইস্কুল নামীয় এই বিদ্যালয়টি ১৮৫৬ সালে স্বীকৃতিলাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন।

সংস্কৃতিচর্চার একটা অনুকূল আবহ বহুকাল পূর্ব থেকেই এখানে বিদ্যমান ছিলো। কুমারখালীর অদূরে ভাঁড়ারায় জন্মেছিলেন বাউল-সাধক লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০), তাঁর সাধনপীঠ ছেঁউড়িয়াও দূরে ছিলো না। গগন হরকরা (১৮৪০?-১৯১০?), গোঁসাই রামলাল (১৮৪৬-১৮৯৪), গোঁসাই গোপাল (১৮৬৯—১৯১২)—এইসব প্রসিদ্ধ বাউলের বসতিও ছিলো কুমারখালীরই শিলাইদহ গ্রামে। কুমারখালী-সন্নিহিত খোক্‌সার জানিপুরে বাস করেছেন সেকালের বিখ্যাত কীর্তনিয়া রবীন্দ্র-নন্দিত শিবনাথ ওরফে শিবু সাহা। শিলাইদহে জমিদারীর সূত্রে এ-অঞ্চলের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১—১৯৪১) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কুষ্টিয়া-কুমারখালী অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১—১৮৯৯), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২—১৯৩৬) প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ অনেকবারই কুমার-খালীতে এসেছেন। ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট নেতৃপুরুষ শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের (১৮৫৭—১৯৩৮) জন্মও এই অঞ্চলেই।

এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই শিক্ষাব্রতী-সাহিত্যসাধক-সাময়িকপত্রসেবী কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে (১৮৩৩—১৮৯৬) কেন্দ্র করে কুমারখালীতে গড়ে ওঠে এক 'কাঙাল-মণ্ডলী'। মীর মশাররফ হোসেন, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—১৯৩০), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০—১৯১৩) আর জলধর সেন ছিলেন সেই 'কাঙাল-মণ্ডলী'র কীর্তিমান সদস্য।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

জলধর সেন বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার অধীন[১] কুমারখালী গ্রামে ১৮৬০ সালের ১৩ মার্চ (১ চৈত্র ১২৬৬) মঙ্গলবার রাত ১০টা ২২ মিনিটে

এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রাশিনাম যোগেন্দ্রনাথ, পোশাকী নাম জলধর। কাঙাল হরিনাথ তাঁর এই পোশাকী নাম রাখেন। হলধর সেন ও কালিকুমারী দাসী তাঁর জনক-জননী। জলধরের পিতামহ ও পিতামহীর নাম যথাক্রমে গদাধর সেন ও ভগবতী দাসী। পিতামহ গদাধর থেকে ঊর্ধ্বতন চার পুরুষের নাম যথাক্রমে অনন্তরাম, বাঞ্ছারাম ও রামরাম।[৩] বংশপরিচয় দিতে গিয়ে জলধর সেন বলেছেন:

> আমার পিতামহের নাম গদাধর সেন। আমরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। আমার প্রপিতামহ কুমারখালীর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম-কুঠীর দেওয়ানীর কাজ পেয়ে কুমারখালীতে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়েন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার বারাসতের নিকট দেগঙ্গ গ্রামে। তাই আমরা এখনও পরিচয় দি, আমরা দেগঙ্গের সেন, আমরা অনন্যের সন্তান।[৪]

জলধরের তিন বছর বয়সকালে (১৮৬৩) বসন্তরোগে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং ১৮৮৭ সালের আগস্ট মাসে মাতৃবিয়োগ হয়। হলধর-কালিকুমারীর দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে জলধর তৃতীয় সন্তান তথা প্রথম পুত্র। এর মধ্যে দ্বিতীয়া কন্যা অতি শৈশবেই মাত্র ছয়মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করে। প্রথমা কন্যা সুসারসুন্দরী দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শশধর বি. এ. পাশ করে সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী পেয়েছিলেন,—১৩১৩ সালের ১ বৈশাখ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৪৪ বছর বয়সে মারা যান। বসন্তরোগে সুসারসুন্দরীরও ঐ একই সালের বৈশাখে মৃত্যু হয়।

জলধরের পিতা 'সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখে এবং হিসাবকিতাবে দুরস্ত হয়ে', গ্রামেরই রামমোহন প্রামাণিকের কাপড়ের দোকানে সামান্য বেতনে চাকুরীতে বহাল হন। ক্রেতাদের আপ্যায়নের জন্য তামাক সাজা আর তাক্ থেকে কাপড় নামিয়ে দেওয়াই ছিলো তাঁর কাজ। পরে রামমোহন প্রামাণিকের বিলাতী কাপড়ের ব্যবসার সূত্রে তিনি কলকাতাবাসী হন। হলধর পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। বেশ কয়েক-বছর কলকাতায় অবস্থানের ফলে নানাভাবে হলধর যথেষ্ট বিত্ত সঞ্চয়

করেন। তিনি গ্রামে 'পূজাপার্ব্বণ, ঠাকুরবাড়ীতে দানধ্যান' করে 'পরম ধার্ম্মিক' বলে খ্যাতিলাভ করেন, ফলে তাঁর উপার্জিত অর্থের উৎস বা বৈধতা সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তাঁর উপার্জন যে যথেষ্টই ছিলো, রক্ষিতার পেছনে উদার অর্থব্যয়ের আড়ম্বর থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। জলধরের জন্মের দিনে তিনি 'দুই হাতে পয়সা খরচ করেছিলেন, কাঙ্গালীও যথেষ্ট বিদায় করেছিলেন'। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাতিদের প্রতারণায় তাঁর পরিবারকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। জলধর সেন বলেছেন :

> ... আমার পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লাম।[৬]

এরপর কিছুকালের জন্য জলধরের দুই পিস্তুতো ভাই এবং পরে পিতৃব্য রামতনু সেন এই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে সচ্ছলতা আসেনি সংসারে, পরানুগ্রহে সমস্যা সংকটে কোনো-ভাবে প্রাণধারণ হয়েছে মাত্র। জলধরকে তাই অতি শৈশব থেকেই চরম দারিদ্র্য আর অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে।

শিক্ষাজীবন

জলধর সেনের বিদ্যাচর্চার হাতেখড়ি হয় কাঙাল হরিনাথের হাতে। জলধর স্মরণ করেছেন :

> সেকালের পদ্ধতি অনুসারে নানা অনুষ্ঠান করে পুরোহিত মহাশয় আমাদের হাতে-খড়ি দেননি।...শুনেছি অনুষ্ঠান সবই হয়েছিল, পরো-হিত মহাশয়ও পূজা-অর্চনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পরম পূজনীয় পরমারাধ্য কাঙাল হরিনাথ।[৭]

এরপর তিনি হরিনাথ-পরিচালিত কুমারখালীর 'বাঙ্গলা স্কুলে' (বঙ্গ বিদ্যা-লয়) ভর্তি হন। এইসময়ে কুমারখালীতে একটি ইংরেজী উচচ বিদ্যালয়, একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, দু-তিনটি পাঠশালা ও চার-পাঁচটি টোল ছিলো।

পাঠশালায় ভর্তি না হয়ে বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশের কারণ হিসেবে জলধর জানিয়েছেন :

> আমি কোন পাঠশালায় পড়িনি। খড়ি প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান শিক্ষারম্ভে করার ব্যবস্থা ছিল, সে উপলক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয় ও গৃহস্থের পুরোহিত মহাশয় কিছু পেতেন। আমার শিক্ষারম্ভে গুরু-পুরোহিত দু'জনেই ফাঁকিতে পড়েছিলেন। . . . আমি একেবারেই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' হাতে করে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। সে সময়ে আমাদের গ্রামের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে আমার বড় দাদা ও মেজ দাদা দু'জনেই পড়তেন। তখনকার ইংরাজি বিদ্যার মাদকতায় বিহ্বল হয়েই বোধহয় বড় দাদা আমাকে পাঠশালা ডিঙ্গিয়ে একেবারে বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা'হলেও জ্যাঠামশায় আমাকে দাতাকর্ণ, গঙ্গাবন্দনা আর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতন সাতপুরুষের নাম কণ্ঠস্থ না করিয়ে ছাড়েন নি।[৭]

অবশ্য 'পাঠশালা ডিঙ্গিয়ে' বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশের বিষয়ে, জলধর অনুমান করেছেন, তাঁর 'শিক্ষাগুরু' 'দীক্ষাগুরু' 'জীবনের আদর্শ' কাঙাল হরিনাথেরও 'হাত ছিল'।[৮] এই বিদ্যালয়ে তাঁর সতীর্থ ছিলেন কাঙালের দুই শিষ্য উত্তরকালে কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

কুমারখালীর বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনের স্মৃতিচারণায় জলধর বলেছেন:

> বাঙ্গলা স্কুলে আমি বাঙ্গলা সাহিত্যে খুব কৃতী হয়ে উঠলাম। অবশ্য সেটা আমার নিজের গুণে যত না হউক, কাঙ্গাল হরিনাথের আশীর্ব্বাদে আর তাঁর শিক্ষার গুণে। . . . . . . আমি সে সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করলেও, বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু বাঙ্গলা স্কুলে কেন, ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণেরও অগ্রগণ্য ছিলাম। সব গোল বাধিয়েছিল ঐ অঙ্কশাস্ত্র। . . . ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব আর পাটিগণিত, এই দুটো কিছুতেই আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করত না, অথচ সে সময়ে সকলেই বলতেন যে, আমার দেহের গঠনের অনুপাতে মাথাটা নাকি বড় ছিল। সে মাথার ভেতর বোধহয় বাঙ্গলা সাহিত্যই সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছিল। আর তার জোরেই একবার যখন স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে যান, সে সময়ে কি যেন কি একটা করুণ রসাত্মক

আবৃত্তি ক'রে তাঁর চোখের জল টেনে বার করেছিলুম, আর তাঁর কাছ থেকে তিনখানা বাঙ্গলা বই তখনই পুরস্কার আদায় করেছিলুম। এই চাপরাসের জোরে, আর কাঙ্গাল হরিনাথের আদরে আমি প্রতি বছরে ক্লাস প্রমোশন পেতাম।[৯]

প্রাথমিক পর্যায়ে গণিতে দুর্বল থাকলেও 'বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভুগোল, এই তিন বিষয়ে' জলধর ছিলেন 'ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র'। তাঁর 'আত্মজীবনী' সূত্রে জানা যায়, পরে আপন অধ্যবসায়ে জলধর গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি মাইনর পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণ নম্বর লাভ করেন। এরপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়ে গণিতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে এল এ. পরীক্ষায় ফেল করলেও গণিতে পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর। জেনারেল এসেমব্লিতে পড়ার সময় তিনি গণিতের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে-র 'সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় বাড়িতে গণিতচর্চা করে এম. এ. ক্লাসের গণিতবিদ্যাও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর হিমালয়-ভ্রমণকালে দেরাদুনের Trigonometrical Survey অফিসের প্রখ্যাত গণিতবিদ্ কালীমোহন ঘোষ জলধরের গাণিতিক-ব্যুৎপত্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন।

জলধরের কুমারখালী বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়াশোনায় ছেদ পড়লো চক্ষু-পীড়ার কারণে। ছেলেবেলা থেকেই জলধর এক অজ্ঞাত চোখের রোগে ছ'মাস অসুস্থ থাকতেন, সে-সময়ে চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না। বলছেন তিনি:

> ··· বৈশাখ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত এই ৫/৬ মাস আমি মোটেই চোখে দেখতে পেতুম না। একেবারে অন্ধ হয়ে যেতুম। চোখের ভেতরে একটা সাদা পরদা উঠে সেটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে, আমার চোখের তারা ঢেকে ফেলত, দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়ে যেত। আবার শীত পড়তে না পড়তেই সে পরদাটা স'রে যেত, আমারও দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসত। সুতরাং আমি সে সময়ে ৬ মাস অন্ধ, ৬ মাস চক্ষুষ্মান। সে জন্যে আমার লেখাপড়াও আধাআধি মত হ'ত।[১০]

এই পরিস্থিতিতে চক্ষুপীড়া বৃদ্ধির কারণে গ্রামের চিকিৎসকের পরামর্শে লেখাপড়া স্থগিত রেখে চিকিৎসার জন্য জলধরকে কলকাতায় পাঠানো

হয়। সেই প্রথম বয়সের কলকাতার স্মৃতি জলধরের মনে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিলো। যাই হোক, দীর্ঘ দু'বছর ধরে কলকাতার সাহেব ডাক্তার দেখিয়ে কিংবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেও কোনো ফল হলো না। এরপর নিরাশ হয়ে জলধর বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এসে কুমারখালীর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে আর পড়া হলো না। জলধর জানাচ্ছেন:

> আমি বাড়ী এসে দেখলুম, আমার ছোটভাই শশধর আমাদের গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়চে। আমি যদি তখন বাঙ্গালা স্কুলে ভর্তি হই, তা' হলে সম্ভবতঃ তার নীচের শ্রেণীতে আমার ভর্ত্তি হতে হয়। ছোটভায়ের নীচের ক্লাসে বড়ভাই পড়বে, এ কি ক'রে হয়! আমি বললাম, আমাকে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি ক'রে দাও। তাতে বাড়ীর সকলেরই আপত্তি, বিশেষত: বড়দাদার। তিনি নিজে ভুক্তভোগী কিনা। গোড়া থেকেই ইংরাজি স্কুলে পড়ে' তাঁর বাঙ্গলার বিদ্যে অতি চমৎকার হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাবশেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ভাল করে' বাঙ্গলা না শিখিয়ে, তিনি আমাদের দু'ভায়ের কাউকেই ইংরাজি পড়তে দেবেন না। শেষে স্থির হ'ল, আমি গোয়ালন্দে গিয়ে সেখানকার মাইনর স্কুলে পড়ব। গোয়ালন্দে তখন সবে একটা মাইনর স্কুল বসেছে।[১১]

১৮৭১ সালে জলধর পড়াশুনার জন্য গোয়ালন্দ গেলেন। প্রথমে স্কুলে ভর্তি না হয়ে বড়দাদার [পিতৃব্য-পুত্র দ্বারকানাথ] কাছে বাড়ীতে মাত্র দু-মাসে মাইনর থার্ড ক্লাসের উপযোগী ইংরেজী শিক্ষা করেন। এইসময়ে লক্ষ্ণৌর এক মশহুর মুসলমান হেকিমের চিকিৎসায় তাঁর চোখের অসুখ আরোগ্য হয়। এরপর তিনি গোয়ালন্দ মাইনর স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিন বছর এই স্কুলে পড়ার পর মাইনর পরীক্ষা দিয়ে ফরিদপুর জেলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। এ-ছাড়া তিনি ইতিহাস বিষয়ে ঢাকা বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে রাজবাড়ীর রাজা সূর্যকুমার গুহ রায় প্রদত্ত রৌপ্য-পদক লাভ করেন। আগে ঠিক ছিলো যে মাইনর পাশের পর তিনি মোক্তারী পড়বেন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্যে অভিভাবকেরা তাঁকে প্রবেশিকা পাশ করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপর বৃত্তিপ্রাপ্ত জলধর ফরিদপুর জেলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। প্রথমে সপ্তাহ দুই এক মেসে কাটিয়ে তিনি ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও উত্তরকালে কুষ্টিয়ার 'মোহিনী মিল' বস্ত্রকলের প্রতিষ্ঠাতা কুমারখালীর মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর (১৮৩৯-১৯২২) আশ্রয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা অসুবিধার কারণে তিন-চারমাস পর তিনি কুমারখালী ইংরেজী স্কুলে এসে ভর্তি হন। সে-সময়ে কুমারখালী স্কুলের সার্বিক অবস্থা এতোই শোচনীয় ছিলো যে তার আগের পাঁচ বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটি ছাত্রও পাশ করতে পারেনি। ১৮৭৮ সালে জলধরসহ মোট চারজন ছাত্র কুমারখালী স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলধর দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে মাসিক দশ টাকা থার্ড গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। জলধরের পূর্বে দীর্ঘ বারো বছর কুমারখালী স্কুল থেকে কোনো ছাত্র বৃত্তিলাভ করেনি। কুমারখালী স্কুলের অপর সফল পরীক্ষার্থী রাধাবল্লভ দে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। জলধর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন। সেবারের বাংলার পরীক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), কলেজে ভর্তি হওয়ার পর জলধর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে হাস্যচ্ছলে বলেছিলেন:

> 'দূর জলধর, হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের নামই ডুবিয়েচিস্। বাংলায় ফার্স্ট হতে পারিস্ নি। ফার্স্ট কে হয়েচে জানিস্? কাদম্বিনী বোস।'[১২]

জলধর যে-কী অপরিসীম দরিদ্র আর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন তার কিছু কিছু চিত্র তাঁর স্মৃতিচর্চায় পাওয়া যায়। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। ব্যয়-সংকোচের জন্য তাঁকে বগুলা স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে কৃষ্ণনগর পৌঁছাতে হয়েছিল। উল্লেখ করেছেন তিনি, ক্ষুধার্ত হয়েও দু-পয়সার মুড়ি-গুড় কিনে খাওয়াকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'নবাবী' করা। স্বল্পমূল্যে আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে তাঁকে পতিতার ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে শেষপর্যন্ত। এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়ে অবিদ্যাতেই আশ্রয়' নিতে হয়েছিল তাঁকে।[১৩] এই একই বছরে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১৮৬৩- ১৯১৩) কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সেকেণ্ড গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। এই পরীক্ষাদানের সূত্রেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে জলধরের গভীর সৌহার্দ-সখ্য গড়ে ওঠে এবং তা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিলো।

প্রবেশিকা পাশের পর জলধরের ইচ্ছে ছিলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান জলধরের বৃত্তির মাত্র দশ টাকা সম্বল করে কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার চিন্তা ছিলো অবাস্তব। তবুও তিনি আশা ছাড়েননি। কিন্তু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জলধরের জীবনের ছক পাল্টে দিলেন। জলধরের নিজের কথায়:

> কলকাতার সিটি কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মশায় আমাদেরই গ্রামের লোক। তিনি সেই সময় বি. এ. পাশ করে এম. এ পড়ছিলেন। কি একটা উপলক্ষে হেরম্বদাদা কুমারখালি গিয়েছিলেন, সেই সময় আমার বড়দাদাও বাড়িতে ছিলেন। হেরম্বদাদা শুনলেন যে, আমি Engineering College-এ পড়বার অসাধ্য-সাধন করবার জন্য বাড়িতে বসে আছি। তিনি বড়দাদাকে বুঝালেন যে, আমাদের মত গরীব লোকের Engineering-এর ব্যয়ভার বহন করা একেবারেই অসম্ভব। তিনি আমাকে জেনারেল লাইনে প্রবেশ করিয়ে দিতে দাদাকে পরামর্শ দিলেন।...তখন আর কি করি, বড়দাদার আদেশ শিরোধার্য্য করে আমি কলকাতায় এলাম।[১৪]

জলধরের কলকাতার কলেজ-জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০–১৮৯১) সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর স্নেহাশীষ লাভ। কলেজে ভর্তির ব্যাপারে জলধর বিদ্যাসাগরের সহায়তার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান কলেজে সীট না থাকায় তাঁকে জেনারেল এসেম্ব্লিতে ভর্তি হতে বলেন, দ্বিতীয় বর্ষে মেট্রোপলিটানে ভর্তি করে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বিদ্যাসাগর জলধরকে আর্থিক সাহায্যদানের কথাও বলেন, যদিও প্রয়োজন না হওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করেননি। বিদ্যাসাগরের সহানুভূতি ও মমত্বপূর্ণ ব্যবহারে অভিভূত হয়ে তিনি বলেছেন:

> আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মানুষের হৃদয়ে যে এত দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না; আমার সেই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ

উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দিয়ে, যে একটি কথা বলেছিলেন, সেকথা এখনও আমার মনে আছে। বল্‌লেন—তোর অবস্থা খারাপ, তাতে কি হয়েছে? আমিও তোর মতন দরিদ্র ছিলুম।[১৪]

জলধর সেন ১৮৭৯ সালের এপ্রিল/মে মাসে জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনে (পরবর্তীকালে স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। এই কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪—১৯৩৮)। গ্রামসুবাদে পরিচিত এক মহাজনের আড়তবাড়ীতে থেকে তিনি কলকাতার পড়াশুনা চালান। পড়াশুনার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন:

> ইংরাজি সাহিত্যে যে খান-দুই বই পড়া হচ্ছিল, তা' একটি বন্ধু দিলেন।...লজিক ফিলজফি ও হিষ্ট্রি তাও কিনতে হ'লনা। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। কিনতে হল---নবীন পণ্ডিতের বিশালকায় রঘুবংশ, আর কার সঙ্কলিত নাম মনে নেই—ভট্টিকাব্য। এই বই দু'খানি দেখেই আমার চক্ষু স্থির। সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় এই দুইখানি কাব্য পড়তে হবে কিনা শ্রীজলধর সেনকে – যার দেবনাগরী বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয়নি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত উপক্রমণিকার 'গো' শব্দের যে কি 'রূপ', তাও তার চক্ষু বা কর্ণ-গোচর হয়নি।[১৬]

এই সংস্কৃতের কারণেই জলধর ১৮৮০ সালের শেষার্ধে এল. এ. পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। মাত্র তিন নম্বরের জন্য তিনি ফেল করেন। জীবন-সায়াহ্নে আফসোস করে বলেছেন:

> বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি নিয়ম থকত—যার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে শুধু সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিতে পারবে, তা' হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সেও গর্ব্ব করে' বলতে পারি যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার দু-তিন বৎসরের মধ্যেই গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আমি এম-এ পাশ করতে পারতাম।[১৭]

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'সংস্কৃতের অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে এল-এ ফেল করে নামকাটা সেপাই হয়ে' কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। জলধরের অসাফল্যে জেনারেল এসেম্ব্রির গণিতের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে অত্যন্ত দুঃখিত হন। প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবও জলধরকে পরের বছর পরীক্ষা

দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং এইসঙ্গে তিনি কলেজের বেতন মওকুফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। পাশাপাশি যে আড়তবাড়ীতে তিনি থাকতেন তাঁরাও আরো এক বছরের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু জলধরের পক্ষে পুনরায় পরীক্ষা প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হলো না, তার প্রধান কারণ এই যে এই একই বছরে তাঁর অনুজ শশধর কুমারখালী ইংরেজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। পরিবারের সকলেই চেয়েছিলেন যে এল. এ. পাশের জন্য জলধর আরো এক বছর পড়াশুনা চালিয়ে যাক এবং শশধর কলেজে ভর্তি না হয়ে নিম্নশ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করুক। কিন্তু জলধর অতি শৈশবে পিতৃহীন অনুজের উচ্চ শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে পরিবারের সকলের প্রস্তাবকে অমান্য করেন। নিজে চাকুরী গ্রহণ করে ছোটভাইকে লেখাপড়া শেখাবেন এই চিন্তা করে তিনি তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ টানেন।' এইখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পরিসমাপ্তি।

বিবাহ ও সংসারজীবন

জলধর সেন ১৮৮১ সালে গোয়ালন্দ স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগদানের পর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর বিবাহের চেষ্টা চলে। কিন্তু তিনি এতে অনীহা প্রকাশ করেন। পরে তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের নির্দেশে বিবাহে সম্মত হন। ১৮৮৫ সালের প্রথম দিকে গোধূলি লগ্নে[১৮] নদীয়া জেলার শিবনিবাস রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী দেওয়ানের বেড় গ্রামনিবাসী অম্বিকাচরণের তিন কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে সুকুমারী ছিলেন কন্যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। সুকুমারী ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ইতিহাসখ্যাত রঘুনন্দন মিত্রের প্রপৌত্রী। এই রঘুনন্দনের সাফল্য ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০—১৮৮৫) বিরচিত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' গ্রন্থে।[১৯] জলধরের বিবাহের কালে দেওয়ানবেড়ের মিত্র-পরিবারের অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয় ও ক্ষয়িষ্ণু। তবুও অম্বিকাচরণ এই বিবাহে সাধ্যমতো আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। জলধর তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছেন:

অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি এবং ভোজের আয়োজনও দেওয়ান-বাড়ীর উপযুক্ত হয়েছিল। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু ৫টি হরতকী দিয়েই কন্যা উৎসর্গ করেছিলেন।[২০]

জলধর-গুরু কাঙাল হরিনাথ এই বিবাহ-অনুষ্ঠানে শরিক হয়েছিলেন। বিবাহ সম্পন্নের পরের রাত্রিতেই বরযাত্রীরা ফিরে আসলেও হরিনাথ সেখানে রাত্রিযাপন করে বিবাহের পরদিন অভিভাবক হিসেবে বর ও বধূকে কুমারখালীতে নিয়ে আসেন। জলধর সেনের এই বিবাহিত জীবন সুখের হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এই বিবাহের সূত্রেই কর্মক্ষেত্রে জলধরের বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। বলেছেন সে-কথা তিনি:

> সেই যে ৮৫ অব্দে ২৫ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্যান্ত আমার সে মাইনে আর পড়েনি। ঐ সালের শেষভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫ টাকা বাড়িয়ে দিলেন।...আমার এ বেতনবৃদ্ধির কারণ এই যে, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে, আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটী লোকবৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।[২১]

জলধর-সুকুমারীর দাম্পত্যজীবনের স্থায়িত্ব ছিলো মাত্র আড়াই বছরের। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে সুকুমারী সংসারে সকলের অকুণ্ঠ স্নেহ-প্রীতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বল্পশিক্ষিতা লজ্জাশীলা এই রমণীও যে বাগবৈদগ্ধ্যে কতো পটু এবং আদর-আপ্যায়নে আন্তরিক ও সৌজন্যপরায়ণ ছিলেন জলধর তার পরিচয় দিয়েছেন আত্ম-জীবনীতে, বরিশালের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অশ্বিনীকুমার দত্তের (১৮৫৬—১৯২৩) গোয়ালন্দে জলধর-গৃহে আতিথ্য-গ্রহণের সূত্রে। স্বামীর অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণে স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে এইভাবে:

> কোন বিলাসদ্রব্য তার আড়াই বৎসর বিবাহিত জীবনে সে পায়নি। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সে সন্তুষ্ট ছিল। তার সম্বন্ধে একই কথা

বলতে পারি যে, সে সমস্ত পৃথিবীটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতে পারত। তিরস্কার করলেও হাসি, কারণে অকারণেও হাসি। কোনপ্রকার অভাব-কেই সে জীবনে আমল দেয়নি। সবই সে হেসে উড়িয়ে দিত।[২২]

বিবাহের প্রায় আড়াই বছর পর ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে সুকুমারী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। জন্মের মাত্র বারো দিন পর সেই শিশুটির মৃত্যু হয়। দুর্ভাগ্য এই যে, এর মাত্র বারো দিন পর সুকুমারীও কলেরা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুকালের কথায় দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) বলেছেন :

আমি তখন কুমারখালীতে, জলধরবাবু তাঁহার চাকরীস্থলে, তাঁহার সাধ্বী পত্নী কুমারখালীতেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁহার কলেরা হইল। অতি ভীষণ ব্যাধি। জলধরবাবুকে বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইল। সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি যখন বাড়ী আসিলেন, তখন সব শেষ। সাধ্বী তখন পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহ গৌরীনদীর তটবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। জলধরবাবুকে ষ্টেশন হইতেই শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইল।[২৩]

স্ত্রী-বিয়োগের মাত্র তিনমাস পর জলধর মাতৃহীন হন। মাত্র চারমাসের ব্যবধানে তিন প্রিয়জনকে হারিয়ে জলধরের মনে সংসার সম্পর্কে নিরাসক্তি ও বৈরাগ্য দেখা দেয়। তাই মানসিক প্রশান্তিলাভের জন্য এরপর তিনি হিমালয়-যাত্রা করেন। এই হিমালয়-ভ্রমণ পর্ব তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে তিনি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের চেষ্টায় ১৮৯১ সালে মহিষাদল রাজস্কুলে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। মহিষাদলে জলধর সেন দীনেন্দ্রকুমারের কাকার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, আর তাঁর কাকারা পুত্র-কন্যারা জলধরের বিশেষ অনুরক্ত ছিলো। জলধরের পুনর্বিবাহে মহিষাদলের বন্ধুদের চেষ্টা থাকলেও এই রায়-পরিবারের ভূমিকাই ছিলো প্রধান। জলধরের দ্বিতীয় বিবাহের পটভূমিকা সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার বলেছেন :

কিছুদিন পরে ডায়মণ্ড হারবারের সন্নিহিত উস্তিতে জলধরবাবুর বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। জলধরবাবু তরুণ যুবক, নিষ্কলঙ্ক

চরিত্র, তিনি সর্ব্বাংশে সুপাত্র। জলধরবাবু এই বয়সে বিপত্নীক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, সমস্ত জীবন পড়িয়া আছে— অথচ তিনি সংসারধর্ম্ম করিবেন না —ইহা সকলেই অসঙ্গত মনে করিলেন। উস্তির দত্তরা সম্ভ্রান্ত পরিবার,...সুতরাং দত্ত-পরিবারে জলধরবাবুর বিবাহে কোন বাধা উপস্থিত হইল না, কাকা সানন্দচিত্তে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। জলধরবাবু তখনও মাথা নাড়িতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয় বড় কোমল, অতীত জীবনের সাংসারিক সুখদুঃখের স্মৃতি তাঁহার কোমল হৃদয় বেদনাতুর করিয়া তুলিল। তাঁহার বিবাহ হইবে শুনিয়া আমার এতই উৎসাহ হইল যে, আমি এক কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম।[২৪]

১৮৯৪ সালে[২৫] জলধর সেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের উস্তি গ্রামে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হরিদাসী। ইনি ছিলেন রায়বাহাদুর গিরীশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। হরিদাসীর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে হরগোবিন্দ দত্ত ও বগলাসুন্দরী দাসী। এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য (পরে পূর্ণিয়ার সরকারী উকিল, রায়বাহাদুর ও বিহার কাউন্সিলের সদস্য)। বিবাহের উদ্যোক্তা ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাকা। এ-বিষয়ে দীনেন্দ্রকুমারের সাক্ষ্য:

> সহায়-সম্পদহীন, সংসারে বীতস্পৃহ, বিপত্নীক যুবক জলধরবাবুকে আমার কাকা তাঁহার মহিষাদলের বাসা হইতে উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া তাঁহার ঘোর অনিচ্ছার মধ্যেই বিবাহ দিয়া আনিলেন . . .।[২৬]

দীনেন্দ্রকুমার আরো জানাচ্ছেন:

> বিবাহের পর জলধরবাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরী করিতে চলিলাম। সে বোধহয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের . . . কথা[২৭]

এই বিবাহের সূত্রে জলধর-হরিদাসী সাত পুত্র ও ছয় কন্যার জনক-জননী হন। জলধরের দ্বিতীয় দাম্পত্য-জীবন সুখের ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তাঁদের প্রথম সন্তান অজয়কুমারের জন্ম হয় ১৮৯৭ সালে। পুত্র-কন্যাদের নাম যথাক্রমে অজয়কুমার, অজিতকুমার, অমিয়কুমার, অচলা,

বিমলা মিত্র, কমলা মিত্র, কুন্তলা বসু, অমলা রায়চৌধুরী, সরলা ঘোষ, অষ্টমীকুমার, অরুণকুমার ও অশ্বিনীকুমার। অজয়কুমারের সঙ্গে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের (১৮৭৭—১৯৪০) জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হয়। পুত্রকন্যাদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলেও দ্বিতীয় পুত্র অজিতকুমার চিত্রশিল্পী হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) একটি বিশিষ্ট শিশুতোষ কবিতা 'সারস পাখী'র জন্মের উৎস অজিত সেনেরই একটি ছবি। জানা যায়:

> 'ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুরের পুত্র শ্রী অজিত সেন ছিলেন একজন সখের চিত্রশিল্পী। অবসর সময়ে তিনি রঙ-তুলি দিয়ে আঁকতেন। তখন ছবি আঁকায় বেশ কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তিনি এবং তাঁর আঁকা ছবি সে সময় লোকের চোখে পড়তে শুরু করেছে। এমনি একসময়ে একদিন তিনি একটি 'সারস পাখী'র' ছবি আঁকেন। . . . . . উজ্জ্বল চোখ মেলে অভিনিবেশ সহকারে ছবিটি দেখে কবি [নজরুল] বললেন: "সত্যিই ভাল হয়েছে ছবিটা।" সুযোগ পেয়ে ভাই ['নওরোজ'-সম্পাদক আফজাল-উল-হক] বললেন, "শুধু প্রশংসা নয়! তোমাকে একটা কবিতা লিখতে হবে ছবিটার উপর।" কবি লিখবেন বলে সম্মতি দিলেন।[২৮]

জলধরের চতুর্থ পুত্র অমিয়কুমারের কনিষ্ঠ সন্তান অধ্যাপক কাজল সেন (অনুপকুমার সেন) সাহিত্যচর্চা করে ইতোমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি 'বাংলা সাহিত্য ও জলধর সেন' অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য। জলধর-পত্নী হরিদাসী পরলোকগমন করেন ১৩৪৫ সালের ৮ মাঘ কলকাতায়। বৃদ্ধবয়সে পত্নী-বিয়োগে জলধর মানসিক ও শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং মাত্র দুই মাস আঠারো দিন পর তাঁর মৃত্যু হয়।

ধর্ম-ভাবনা

ধর্ম সম্পর্কে জলধর সেনের মনোভাব ছিলো উদার। মুক্তবুদ্ধিশাসিত জলধরের ধর্ম-ধারণা ছিলো যথার্থই রক্ষণশীলতামুক্ত, মনে-প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকলেও আতিশয্য ছিলো না। ধর্মের

জলধর সেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

আচরিক দিক সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন এই উদার দৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন গুরু কাঙাল হরিনাথের নিকট থেকে।

রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও বিশ্বাস প্রবল ছিলো না। তাঁর বাল্য-সুহৃদ তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে তন্ত্রাশ্রয়ী হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে তাঁর মতপার্থক্য ছিলো। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য :

> আমি তন্ত্র-শাস্ত্র পড়িনি, এখনও তার কিছুই জানিনে; কিন্তু তা হলেও আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছিনে যে আমি তন্ত্রশাস্ত্রের বিরোধী ছিলাম এবং এখনও আছি। আমি তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের সাধন কি জানিনে। কিন্তু ঐ পাঁচটি ম-আদি নাম শুনে তখনও শিউরে উঠতাম—এখনও উঠি। রক্তবস্ত্র-পরিহিত সিন্দুর চর্চিত-ললাট হাতে-গলায় একরাশ মালা—এ মানুষ দেখলেই আমি দশ হাত দূরে সরে দাঁড়াতাম, এখনও দাঁড়াই। ও মূর্তি আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার তো করেই না, ত্রাসের সঞ্চার করে। আমি চোখ বুঁজে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা স্মরণ করে কেঁপে উঠি।[২৯]

জলধরের এই ধর্ম-ধারণা সম্পর্কে তাঁর সুহৃদ দীনেন্দ্রকুমার রায় তীব্র সমালোচনা ও ভর্ৎসনা করেছেন। 'হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী' বলে তাঁকে আক্রমণও করেছেন। দীনেন্দ্রকুমারের অভিযোগ :

> রায়বাহাদুর এই সুপ্রবীণ বয়সেও যে শাস্ত্র পড়েন নাই—জানেন না, এখনও তিনি সেই নিত্য-সত্য তন্ত্রশাস্ত্রবিরোধী,—ঘৃণা—অশ্রদ্ধার ভাব প্রচার করিতেছেন। তিনি যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত নহেন; তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী এই সদম্ভ উক্তি তাহাই প্রমাণ করে না কি? কারণ দীক্ষার বীজমন্ত্ররাজি—যাবতীয় সাধন-পদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্রে সমাহিত। বৈষ্ণবভাবে সাধনাও তন্ত্রেরই প্রকারভেদ মাত্র।[৩০]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬—১৮৮৬) সম্পর্কে যৌবনে আগ্রহ জেগেছিল, দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেনও, কিন্তু ভক্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি। তাঁকে দূর থেকে কৌতূহল মিটিয়েছেন মাত্র। জলধরের নিজের জবানীতেই জানা যায় :

> সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানীগুণী

মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু'একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম। কোনদিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কিনা সন্দেহ—কৃপাদৃষ্টি তো মোটেই নয়।[৩১]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩—১৯০১), পরবর্তীকালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত, জলধরের কলেজ-ত্যাগের পরের বছর (১৮৮১) জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন। জলধর বিবেকানন্দকে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে পূর্ব থেকে চিনলেও আলাপ-পরিচয় হয়নি কখনো। হিমালয়-ভ্রমণকালে তিনি সন্ন্যাসী-প্রদত্ত এক ঔষধের সাহায্যে মারাত্মক পীড়িত বিবেকানন্দের প্রাণরক্ষা করেন। এরপর দেরাদুনে এক গৃহে তিনি বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। সেখানে 'গভীর ধর্ম্মচর্চা, শাস্ত্রালোচনা, তর্ক-বিতর্ক' কিছুই হয়নি, আসর অধিকার করেছিল 'সুধু গান, সুধু আনন্দ, সুধু স্ফূর্তি, সুধু রহস্যজনক গল্পগুজব।'[৩২] এতো বড়ো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে সংসার-বৈরাগ্যের কালে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে পেয়েও ধর্মভাবের প্রেরণা-লাভে জলধরের আগ্রহ জাগেনি।

ছেলেবেলা থেকেই হিন্দুধর্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি জলধরের অধিক আগ্রহ ও অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ছেলেবেলায় চিকিৎসার জন্য একবার তিনি কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নেতৃপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের স্নেহ-প্রীতি লাভ করেন। এই ঘটনা তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর বিবৃতিতে সেই সময়ের কথায় জানা যায়:

> ব্রাহ্ম সমাজের কেশব সেন অগ্র-পশ্চাৎ সেই সময়েই বোধহয় বিলেত থেকে ফিরে এসেচেন। মেছোবাজারে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হয়েচে। এ কথাটি বলচি এই জন্য যে, আমার পিসতুতো ভাই কেশব সেনের চেলা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে প্রতি রবিবারে যেতাম। কেশববাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরবাবু, গৌরগোবিন্দবাবু ও আরও বড় বড় ব্রাহ্ম আমাকে ভাল-বাসতেন। দাদার সঙ্গে আমি আদি ব্রাহ্ম-সমাজেও গিয়েছি। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও গায়ক বিষ্ণুবাবুর সম্মুখে আমি পড়েছিলুম। দাদা

আমাকে তাঁর ছোটভাই বলে' পরিচয় করে' দিলে, আমি তাঁদের দু'জনকেই প্রণাম করেছিলুম। মহর্ষি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। যে আশীর্ব্বাদের কথা আমি এখনও ভুলিনি।[৩৩]

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে জলধরের পূর্বাপর গভীর সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন:

> বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়; তারপর যখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও "সাধারণ" দল-ভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ-সমাপ্তি পর্যন্ত আমি যথানিয়মে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর কলিকাতাতেও তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন।[৩৪]

গোয়ালন্দে জলধরের শিক্ষকতার কালে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানকার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ নব্য ব্রাহ্মদের ওপর নানা নির্যাতন-অপমান আরম্ভ করেন। এতে জলধর বিশেষ ব্যথিত হন। অবশ্য পরে কাঙাল হরিনাথের উদ্যোগে এর একটা প্রীতিকর মীমাংসা হয়। জলধর ছিলেন এই প্রয়াসে কাঙালের প্রধান সহায়।

জলধর দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর যে গভীর আকর্ষণ ও পক্ষপাত ছিলো তা কখনো প্রচ্ছন্ন থাকেনি। অবশ্য উত্তর জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগের কোনো খবর পাওয়া না গেলেও এককালের অনেক নিষ্ঠ ব্রাহ্মের মতো বার্ধক্যে পৌঁছে কট্টর হিন্দুতে তিনি পরিণত হননি। শেষজীবনে কী হিন্দু কী ব্রাহ্ম কোনো ধর্মেরই আচরিক দিক সম্পর্কে তিনি আর তেমন আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না।

কর্মজীবন

এল. এ. ফেল করার পর অনুজ শশধরের কলেজ-শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য জলধর চাকুরী গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের সূচনায় জলধর ১৮৮১ সালে তাঁর পিতৃব্য-পুত্র গোয়ালন্দ ফৌজদারী আদালতের পেশকার দ্বারকানাথ সেনের চেষ্টায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলের থার্ড মাস্টারের পদে নিযুক্ত হন। জলধরের ছাত্রকালে এই স্কুল ছিলো মাইনর, পরে এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হওয়ার দু-তিন বছর পর জলধর এখানে শিক্ষক হয়ে আসেন। তাঁর কথায়:

> মাসে পঁচিশটি টাকা পাই—অবশ্য এক আনা কম—সেটা রসীদ ষ্ট্যাম্পের দাম। টাকা কয়টি এনে বড় বৌদিদির হাতে দিই। তিনি শশধরের কলিকাতায় পড়াবার খরচ পাঠান। আমি নিশ্চিন্ত মনে খাই-দাই, ছেলে পড়াই। আর পূর্ব্ব-সংস্কারবশে একটু-আধটু স্বদেশীও করি, বক্তৃতাও করি—গোয়ালন্দে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের সমস্ত অনুষ্ঠানের পেছনেও থাকি।[৩৫]

নিছক জীবিকার একটা অবলম্বন হিসেবেই শিক্ষকতা পেশাকে তিনি গ্রহণ করেন, এ-বিষয়ে আদর্শের মহৎ ইচ্ছা তাঁকে প্রাণিত করেনি। বলেছেন তিনি:

> মাষ্টারী করা ছাড়া তখন আমার উপায়ন্তর ছিল না। একটু রয়ে-বসে চেষ্টাচরিত্র করলে, কিছুদিন কোন সরকারী আফিসে ঘরের খেয়ে শিক্ষা-নবিশী করলে হয় ত কোন একটা ভাল চাকুরী জুটতে পারত। কিন্তু তখন আমি এমনই বিপন্ন, আমার তখন অর্থের এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে' তার পর বৎসরই আমাকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল। যে বৎসর আমি এল-এ ফেল করলাম, সেই বৎসরই আমার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর শশধর আমাদের গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাই দু'বৎসর কলেজে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার ভাই শশধর বৃত্তি পান নাই। তাঁরই পড়াবার খরচ সংগ্রহের জন্য আমাকে মাষ্টারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল।[৩৬]

যাই হোক, এই শিক্ষকতা পেশায় সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। তাঁর স্বপ্ন ছিলো ম্যাটসিনি-গারিবল্ডির মতো দেশনায়ক হবেন, স্বদেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ

করবেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্নভঙ্গ হলো, আফসোস্ করে বলেছেন তিনি,—"ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—বিধাতার বিধানে আমি হলাম এক গ্রামের স্কুলের পঁচিশ টাকা বেতনের থার্ড মাষ্টার।"[৩৭] ১৮৮৫ সালের শেষভাগে তাঁর পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়।

১৮৮৭ সালের শুরুতে মাত্র চারমাসের ব্যবধানে জলধর কন্যা, পত্নী ও জননীকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন, সংসার সম্পর্কে ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য জন্মায়। ফলে গোয়ালন্দ স্কুলে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। তর্তদিনে অনুজ শশধর বি. এ. পাশের পর সরকারী স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী লাভ করে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হিমালয়যাত্রী জলধর দেরাদুনে এসে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। বরিশালনিবাসী কালীকান্ত সেন নামে এক শিক্ষাব্রতী দেরাদুনে একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই একান্ত অনুরোধে আহার ও আশ্রয়ের বিনিময়ে জলধর সেই স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।[৩৮] এখান থেকেই তিনি ১৮৯০ সালের ৬ মে হিমালয়ের পথে বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে জলধর সেন তাঁর সুহৃদ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের আগ্রহ ও চেষ্টায় ১৮৯১ / ৯২ সালে মহিষাদল রাজ-স্কুলে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এ-বিষয়ে দীনেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন :

> কুমারখালী প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় কাঙ্গালের সাহচর্য্য অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু সংসারী হইবার জন্য আর তাঁহার আগ্রহ হইল না। কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তিনি কষ্টকর মনে করিলেন। তিনি সংসারত্যাগের পূর্ব্বে মাষ্টারী করিতেন; কোথাও মাষ্টারী পাইলে আবার ছেলে পড়াইতে আরম্ভ করিবেন—বন্ধুগণের নিকট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।.....
>
> মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল। শিক্ষকের জন্য কোন কোন ইংরাজী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কাকাই স্কুলের কর্ত্তা; আমি তাঁহাকে বলিলাম, তৃতীয় শিক্ষকের গণিতে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন; জলধরবাবু গণিতে বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁহাকে জানি, আপনার ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর শিক্ষক পাইবেন না, এতদ্ভিন্ন আমি

মাষ্টারী করিয়া এল-এ দিব, অথচ আমি গণিতে এত কাঁচা যে, কোন গণিতজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। জলধরবাবু যদি দয়া করিয়া আমাদের বাসায় থাকেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি; তিনি চেষ্টা করিলে হয় ত গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবেন।[৩৯]

মহিষাদল রাজস্কুলে তিনি প্রায় আট বছর শিক্ষকতা করেন। অবশ্য এর পাশাপাশি মহিষাদলের নাবালক রাজকুমারদের অভিভাবকত্বের দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তেছিল। মহিষাদল-অবস্থান জলধরের জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এখানে থাকতেই তিনি পুনরায় সংসারী হন এবং তাঁর সাহিত্য-চর্চার সূচনাও এখান থেকেই হয়। মহিষাদল ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় আসেন এবং সংবাদপত্র-জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। মাঝে কেবল দুই বৎসর (১৯১০-১২) তিনি সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর (১৮৭৩-১৯৪৯) পুত্র-কন্যাদের গৃহশিক্ষক ও জমিদারী-এস্টেটের দেওয়ান হিসেবে কাজ করেন। অল্পকাল প্যারাগন প্রেসের ম্যানেজারও ছিলেন। এই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাময়িকপত্র-সম্পাদনা ও পরিচালনার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। সে তাঁর জীবনের ভিন্ন এক অধ্যায়, তাঁর কর্মজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় পর্ব।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জলধর সেনের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রায় সকলেই বলেছেন তিনি ছিলেন সহজ-সরল, বিনয়ী-নম্র-মধুরভাষী, অহমিকাশূন্য, সহিষ্ণু, অকপট,, বন্ধু-বৎসল, কর্তব্যনিষ্ঠ, মর্যাদা-সচেতন, ভোজনরসিক আর হাস্য-পরিহাসপ্রিয় মজলিশি মেজাজের মানুষ। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে কেউ কেউ তাঁকে 'অজাতশত্রু' বলেও অভিহিত করেছেন।[৪০]

জলধর তাঁর চরিত্রের অকৃত্রিম আন্তরিকতায় সকলকে যেমন আপন করে নিয়েছিলেন, তেমনি অন্যের মনে গভীরভাবে দাগ কাটতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সারল্য, অনাড়ম্বরতা, শান্ত-সৌম্য-বিনয়ী ভাব সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের উক্তি-মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬) বলেছেন, "···আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, তাঁর তুল্য বিনয়ী লোক সচরাচর দেখতে পাওয়া যাবে না। তাঁর শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিলনা। এ গুণ আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল। আমরা প্রায় কেউই অহমিকাবর্জ্জিত নই। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি স্বভাবতই নিরহঙ্কার ও বিনয়ী তিনি লোক-সমাজে সহজেই জনপ্রিয় হন। এবং আমার বিশ্বাস আমাদের সাহি-ত্যিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই, জলধর সেন যাঁর প্রীতি আকর্ষণ করেননি।[৪১] সরলা দেবীর (১৮৭২-১৯৪৫) সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তাঁর সম্পর্কে এই যে, ". . . সরল সাদাসিদে মানুষটি, ভাবে ঢল ঢল, বিনয়ে গল গল।'[৪২]

জলধর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২) অভিমত হলো :

. . . সকলেরই এই সরল স্বভাব, নিরীহ এবং নিরহঙ্কার লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির শেষ ছিলনা। বোধকরি, বাঙ্গলার মাটির

সঙ্গে এই শান্ত সাহিত্যাচার্য্যের একটা ঘনিষ্ঠ অথচ অদৃশ্য সংযোগ ছিল, যার জোরে তিনি বাঙ্গালীর চিত্তকে এমন ক'রে আকর্ষণ করেছেন যা অল্প লোকেই পারে।[৪৩] প্রফুল্লকুমার সরকার (১৮৮৪-১৯৪৪) জলধরের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

এমন মধুর প্রকৃতি, উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়, অমায়িক সৌজন্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম, যাহা আধুনিক সমাজে খুব কমই দেখা যায়। . . . . . কোনদিন তাঁহাকে আমি বিরক্ত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই, ব্যবহারে সরলতার অভাব অনুভব করি নাই ; এ কেবল আমার পক্ষের কথা নয়, বাঙ্গলার সাহিত্যিকমাত্রই তাঁহাদের পক্ষ হইতে এ কথার সাক্ষ্য দেবেন।[৪৪]

একালের এক খ্যাতিমান সম্পাদক সাগরময় ঘোষ জলধরের সরল-বিশ্বাসের এক অম্ল-মধুর কাহিনী শুনিয়েছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) একবার জলধরের গ্রন্থ-প্রকাশে আর্থিক সাহায্যলাভের জন্য তাঁকে লালগোলার রাজার কাছে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সরল জলধর শরৎচন্দ্রের এই রসিকতা আঁচ করতে না পেরে লালগোলায় গিয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন।[৪৫] প্রকৃতপক্ষে সাবল্য, সৌজন্য, বিনয়, অকপটতা জলধরের অনুশীলিত বা পোশাকী গুণাবলী নয়, তা ছিলো তাঁর স্বভাবেরই অন্তর্গত।

জলধরের সংযম-সহিষ্ণুতাও তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিন্দা-সমালোচনা কোনোকিছুই তাঁকে বিচলিত বা উত্তেজিত করতে পারেনি কিংবা তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক সৌম্য-শান্ত ভাবের বিচ্যুতি ঘটাতে পারেনি। তাঁকে জীবনে কখনো কখনো অনুচিত আক্রমণ ও ঈর্ষাজাত নিন্দা-সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। বিশেষ করে তাঁকে জীবনসায়াহ্নে তাঁর সাহিত্য-সাংবাদিকতা ও সামাজিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচর ও সুহৃদ দীনেন্দ্র-কুমার রায়ের তীব্র সমালোচনা ও অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। দীনেন্দ্র-কুমার তাঁর স্মৃতিকথায় জলধরের 'হিমালয়' ও 'প্রবাসচিত্র' বই দু'খানার রচনাকার হিসেবে নিজের দাবী উপস্থিত করে জলধরকে গ্রন্থকারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে চান। শুধু তাই নয়, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত জলধরের 'স্মৃতি-তর্পণ' শীর্ষক স্মৃতিচর্চার বিদ্রূপাত্মক তীব্র সমালোচনা

প্রকাশ করেন 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা' নামে ('বসুমতী' : আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৪৩)। জলধর আবেগমিশ্রিত মার্জিত ভাষায় অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে সেই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> ...বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমাকে অজস্র ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তীব্র পরিহাস ও আক্রমণ করেছেন, জানিনা এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং এরূপ ব্যবহারে তাঁর গৌরব কতদূর বৃদ্ধি পাবে, তবে আমি এ সমস্ত অপমান তাঁর বৃদ্ধ বয়সের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত "গুরুদক্ষিণা" বলেই প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ করলেম।[৪৬]

চরিত্রের স্বাভাবিক সহনশীলতা ও সংযম দিয়েই জলধর এইসব বিরোধিতার মোকাবেলা করেছেন। পরিচিত প্রিয়জনের অসৌজন্য ও অনুদারতার আঘাত তিনি নীলকণ্ঠের মতোই হজম করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর এক অনুরাগী বলেছেন :

> জলধর সেন মহাশয়ের পরিপাক করবার শক্তি অসাধারণ।... বলছি মনের পরিপাক করবার শক্তির কথা। স্তুতি এবং নিন্দা উভয়ই তিনি এমন অবলীলার সহিত পরিপাক করেন যে, উভয়ের মধ্যে কোনটি তাঁর কাছে অধিকতর দুষ্পাচ্য তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। সংসারে কোনো বস্তরই অভাব নেই, তাই তাঁর মত অজাতশত্রু ব্যক্তিরও শত্রুর অভাব নেই, সুতরাং কখনো কখনো তাঁকেও নিন্দা অবাধে গলাধঃকরণ করতে হয়। এক একবার মনে হ'য়েচে, এবার চোট্‌টা বড় বেশী রকম হ'ল, যন্ত্রণা দেবে বোধহয়; কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেচি হঠাৎ কখন সেন মহাশয় বেদনার সমস্ত কাঁটাটি হজম ক'রে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে আছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন গীতার নির্ব্বিকার মনের ঠিক অনুরূপ।[৪৭]

অকপট ও সত্যভাষী এই মানুষটি তাঁর জীবনের অনেক অগৌরব ও গ্লানির কথা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছেন। তিনি এ কথা জানাতে বিন্দু-মাত্র দ্বিধা করেননি বা আড়াল মানেননি যে তাঁর পিতা কলকাতার চাকুরীজীবনে রক্ষিতা পোষণ করতেন কিংবা তাঁর পিতা অবৈধ উপায়ে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন। শিথিল চরিত্রের পিতার পুত্র হিসেবে তাঁর

মধ্যে কোনো হীনমন্যতা বা গ্লানিবোধ গড়ে ওঠেনি, অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই গ্রহণ করেছেন বিষয়টি।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন দারিদ্র্য। অতি শৈশব থেকে দারিদ্র্যের স্বাদ লাভ করে করে বড়ো হতে হয়েছে, দারিদ্র্যের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে, কিন্তু উত্তরকালে যখন স্বাচ্ছন্দ্য-স্বচ্ছলতা এসেছে, ভোলেন নি সেই দুঃখ-কষ্টের দিনগুলোর কথা, জীবনে যখন তিনি সাফল্যের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত, দেশ-জোড়া খ্যাতি তাঁর, সেই সময়েই নগ্নভাবে প্রকাশ করেছেন সেইসব কথা। বৃত্তির টাকার ওপর নির্ভর করে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে, বই-পুস্তক সংগ্রহ করতে হয়েছে ধার করে---নকল করেও নিতে হয়েছে কখনো কখনো। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় আহার-আশ্রয়ের জন্য অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্য অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে তাঁকে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে কৃষ্ণনগরে যাওয়ার পথে বগুলা ষ্টেশনে নেমে দশ-বারো মাইল পথ তাঁকে হেঁটে যেতে হয়েছিল, রেস্ত না থাকায়। ক্ষুধার্ত হয়েও দু'পয়সার মুড়ি-গুড় কিনে খাওয়ার 'নবাবী করবার লোভ সংবরণ' করতে হয়েছে তাঁকে। অর্থ সাশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়ে পতিতাগৃহে আশ্রয় নিয়েছেন এবং একবেলা করে উপোষ থেকেছেন। সে-সময়ের পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

> ···আমার সঙ্গে নিজের পরিধেয় ময়লা ধুতি ও চাদর ব্যতীত একখানি কাপড় ও একখানি চাদর; জামাজুতা ব্যবহার করবার সঙ্গতি তখন পর্যন্তও আমার হয় নাই। বই-এর বোঝা আমার বেশী ছিল না, কারণ অধিকাংশ বই-ই তো আমি কিনতে পারিনি, সহপাঠীদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তেই পড়া শেষ করেছিলাম।[৪৮]

প্রতিষ্ঠার শিখরে অবস্থান করে ফেলে আসা অতীতের দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্যের এমন অকপট স্বীকারোক্তির নিদর্শন বাঙালী সমাজে অতি দুর্লভ।

দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন স্বেচ্ছায়, কিন্তু মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি---আদর্শ বিসর্জন দেননি। কলকাতায় যখন কলেজে পড়তে গেছেন তখন বিদ্যাসাগরের স্নেহ-সান্নিধ্যে এসেছেন, বিদ্যাসাগর অযাচিতভাবে দরিদ্র জলধরকে অর্থ-সাহায্য করতে চেয়েছেন,

কিন্তু কষ্ট করেছেন অথচ তিনি সেই দান গ্রহণ করেননি। তাঁর এই আচরণে বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন। দরিদ্র জলধর অনুগ্রহজীবী দান-গ্রহিতা হয়ে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে চাননি। মত আর আদর্শের মিল না হওয়ায় অভাবী জলধর 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' প্রত্রিকার কর্মত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

কর্তব্যনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, স্নেহপরায়ণ এই মানুষটি নিজেকে স্বজন ও বান্ধবদের একটি আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদরের উচ্চশিক্ষার জন্য নিজে লেখাপড়ায় ছেদ টেনে চাকুরী গ্রহণ করেছেন। আন্তরিকভাবেই মনে করেছেন, "আমার একমাত্র ছোটভাই—তাকে তিনমাসের রেখে বাবা মারা যান। যেমন করে হোক, তাকে লেখাপড়া শেখাব।"[৪৯] তাঁর এই উচ্চারণে অগ্রজের কর্তব্যনিষ্ঠা ও অপত্য স্নেহের একনিষ্ঠ নিদর্শন মেলে। পরিবারের প্রতি ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ টাকা মাইনের বৃত্তি লাভ করে কুমারখালী স্কুলে যখন তিনি পড়তেন তখনো সেই সামান্য অর্থ থেকে পরিবারে সাহায্য পাঠাতেন নিয়মিত :

> আমার মা, বিধবা বোন ও ছোটভাই তখন গোয়ালন্দে বড় দাদার কাছে থাকতেন, তাঁদের খরচ বড় দাদাই বহন করিতেন। তা হ'লেও আমি বেশ বুঝতে পারতাম, তাঁদের দু'চার পয়সা কোন কারণে দরকার হোলে বড় দাদা বা বৌদিদির কাছে চাইতে তারা সঙ্কোচবোধ করতেন। এই কারণে আমি প্রতি মাঠে বড় দাদা ও বৌদিদির অজ্ঞাতে মাকে ৩ টাকা পাঠিয়ে দিতাম। মা অনেকবার বারণ করেছিলেন কিন্তু আমি তা শুনিনি।[৫০]

জলধর ছিলেন স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার এক অনন্ত উৎসধারা। সাগরময় ঘোষ উল্লেখ করেছেন, একবার তাঁর এক শিল্পী-বন্ধুর আঁকা শরৎচন্দ্রের একখানা ছবি 'ভারতবর্ষে' ছাপার অনুরোধ নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে জলধর সেনের কাছে আসেন। ছবিটি জলধরের পছন্দ না হওয়ায় ছাপার অনুরোধ নাকচ হয়ে যায়। মনঃক্ষুণ্ন সাগরময় যখন উঠে আসছেন তখন জলধর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন যে তাঁর খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে জলখাবার আনার নির্দেশ দেন, কেননা সাগরময়ের 'অস্নাত অভুক্ত হতাশ চেহারা ওঁকে ব্যথা দিয়েছে'।[৫১]

সকলের সঙ্গেই একটা গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর হৃদয়ে ঠাঁই ছিলো সকলেরই। কখনো কেউ হয়তো প্রণামের জন্য তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে কিন্তু তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে বুকে জরিয়ে ধরেছেন। তাঁর এই অফুরন্ত প্রীতি আর বিশাল অন্তরের জন্য 'সর্বজনীন দাদা' হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন। সকলের কাছেই তিনি ছিলেন এক পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। তাঁর চরিত্রের এই বিরল গুণের কথায় প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭–১৯৮০) বলেছেন:

> শক্তিমান ও অকৃতী, প্রতিভাবান ও পঙ্গু, বন্ধু ও বিরোধী, ইতর ও ভদ্র—সবার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা। জগতে অনেক বড়ো কাজ আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করা—এমন কাজে জলধর সেন মহাশয় বিশেষ উৎসাহী, এই কথাটা তাঁর অন্তরঙ্গদের নিকট অবিদিত নেই।[৫২]

'মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি'—মানুষ জলধরের প্রকৃতি-বিচারে এই কথাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

বপুষ্মান্ জলধরের ভোজনরসিক হিসেবেও বিশেষ পরিচিতি ছিলো। নিমন্ত্রণলাভ সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা সর্বজনবিদিত। বলা চলে, এ-বিষয়ে:

> তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক। খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন এলে ভদ্রতা রক্ষার জন্য তাঁকে যেতে হত, এ কাজটাকে উনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। আসলে জলধরদা আর সব বিষয়েই নির্লোভ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একটিমাত্র দুর্বলতা ছিল, তিনি ছিলেন সত্যিকারের ভোজনবিলাসী।[৫৩]

শুধু তাই নয় এ কথাও জানা যায় কেউ নিমন্ত্রণ করলে সৌজন্যের অনুরোধে 'না' করতে পারতেন না। এ ছাড়া "একদিনে যদি একাধিক নেমন্তন্ন থাকে – উনি কোনোটাতেই গরহাজির থাকতেন না এবং প্রত্যেকটিতেই সমপরিমাণ আগ্রহ নিয়েই আহারাদি করতেন।"[৫৪]

তবে জলধর নিজেই যে কেবল ভোজনপটু ছিলেন তা নয়, অন্যকে আহার করিয়েও আনন্দ পেতেন। আপ্যায়ন আথিতেয়তায়ও তাঁর সুনাম ছিলো। দীনেন্দ্রকুমার রায় কুমারখালীর কাঙাল হরিনাথের স্মরণোৎসবের

বিবরণ দিতে গিয়ে জলধরের অতিথি-সৎকার ব্যবস্থার বড়ো সরল চিত্র এ কেছেন :

> জলধরবাবুর যেরূপ আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম কুমারখালীতে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণের প্রধান লক্ষ্য আহার, কাঙ্গালের উৎসব উপলক্ষ্য মাত্র। বুঝিলাম, কাঙ্গালের উৎসবে তিনি তাঁহার প্রিয় অতিথিগণের জন্য রাজভোগের আয়োজনে ব্যস্ত।[৫৫]

অভ্যাগত অতিথিদের জন্য জলধর গৃহে আয়োজিত জলযোগের খাদ্য-তালিকায় 'কান্দাহারের মেওয়া হইতে কুমারখালীর তরমুজ পর্যন্ত' অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শী ও ভোক্তা স্বয়ং দীনেন্দ্রকুমারের। জলধর-প্রযোজিত এমন আন্তরিক ভূরিভোজনের ঘটনা বিরল ছিলো না।

সময় সম্পর্কে ছিলেন সচেতন, কাজ করতেন রুটিন-মাফিক। সভা-সমিতিতে তাঁকে গর-হাজির পাওয়া যেতো না বললেই চলে। জানা যায় :

> জলধরবাবুর নিয়মানুগ ভাব ও সময় সম্বন্ধে লক্ষ্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিল। ঠিক সময়ে তিনি প্রতিদিন 'ভারতবর্ষ' কার্যালয়ে আসি-তেন—সব সভাতে, সমিতিতে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাইতেন।[৫৬]
>
> নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার ও সংশোধনে ছিলেন অকুণ্ঠ-উদার। ত্রুটি-নির্দেশকারীর প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট হতেন না কখনো, বরঞ্চ কৃতজ্ঞচিত্তে তা কবুল করে নিতেন।[৫৭]

জলধর ছিলেন মজলিসি-মেজাজের মানুষ। তাঁর রঙ্গ-রসিকতার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সাহিত্যের আড্ডায় হাজিরা দিতে কখনোই আগ্রহ হারান নি। 'ভারতবর্ষ' থেকে 'রবিবাসর' পর্যন্ত তাঁর আড্ডার ভূগোল ছিলো প্রসারিত। গানে-গল্পে আসর মাতিয়ে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিলো। সংস্কার-মুক্ত ছিলেন বলেই বয়োকনিষ্ঠদের ধূমপানের উদার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

জলধর সেনের হাস্য-কৌতুক-রঙ্গ-রসিকতা তাঁর চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো। মাঝে-মধ্যেই তিনি নিজেকে আড়াল অথবা উন্মোচন করতে রঙ্গ-রসিকতার আশ্রয় নিতেন। নাছোড় নবীন লেখক-দের হাত এড়ানোর জন্য তিনি অনেকসময়ই কানে কম শোনার ভান করতেন। এই অবস্থার আলাপচারিতা যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক যোগাতো।

কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্র এ-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন :

> জলধরদার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'চার মাস আগে একটা গল্প দিয়াছিলাম, সেটা কি আপানার মনোনীত হয়নি?
>
> জলধরদা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ডান কানের পিঠে হাত রেখে বললেন—
>
> 'কি বললেন? শরীর? সঙ্গমে এসে পড়েছি। এখন মহাসমুদ্রে বিলীন হলেই হয়।'
>
> বুঝলাম, আমার প্রশ্ন শুনতে পাননি। তাই আরেকটু গলা চড়িয়ে আমার লেখার কুশল প্রশ্ন করলাম।
>
> —'লেখা? লেখা-টেখা সব এখন বন্ধ। বয়েস হয়েছে, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ। নতুন লেখায় হাত দিতে পারছিনা।'[৫৮]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩—১৯৭৬) এইরকম রসালো অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।[৫৯] এই অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করেই তিনি নব্য লেখক-দের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতেন। আবার নিমন্ত্রণবাড়ীতে সাহিত্য-যশঃ প্রার্থীদের প্রদত্ত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সাগ্রহে তিনি গ্রহণ করতেন—লেখার প্রচুর প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু সেই লেখা কখনোই পত্রিকায় ছাপা হতো না। ছাপার নানা অজুহাতও তৈরী থাকতো। যেমন, যে কোটের পকেটে লেখাগুলো ছিলো তা তাঁর অজ্ঞাতে বাড়ীর লোকজন ধোপাবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার নিমন্ত্রণবাড়ীর কেউ প্রদত্ত লেখার ভাগ্য জানতে চেয়ে চিঠি লিখলে তিনি প্রেসে দিয়েছেন, সময়মতো ছাপা হবে বলে জবাব দিতেন। কিন্তু বলাবাহুল্য সে লেখা আশ্রয়লাভ করতো বাতিল কাগজের ঝুড়িতে।

সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ছিলো শ্রদ্ধা-প্রীতির আন্তরিক সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এক গভীর সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল। তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিলো অপরিসীম ও অকৃত্রিম। জলধর-সং-বর্ধনায় কবির শুভেচ্ছা ও জলধরের মৃত্যুতে রচিত শোক-চৌপদী এই সম্পর্কের গভীরতা প্রমাণ করে।[৬০] বয়োকনিষ্ঠ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জলধরের

ছিলো অগ্রজ-অনুজের সম্পর্কে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে জলধরের প্রেরণাসঞ্চারী ভূমিকার কথা বিস্মৃত হওয়ার নয়। এ-কথা সত্য যে:

> কত নবীন সাহিত্যিককে যে তিনি উৎসাহ দিয়া পাকা সাহিত্যিকে পরিণত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গলার সাহিত্যজগতে ইহা তাঁহার একটি প্রধান কীর্তি; এমন কি, পাকা জহুরীর মত বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে তিনিই প্রথম ভাল করিয়া চিনিতে পারেন এবং সাহিত্যজগতে তাঁহাকে প্রচার করেন। অনেকেই জানেন, অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী শরৎচন্দ্র একটু অলস প্রকৃতির ছিলেন, সহজে কিছু লিখিতে চাহিতেন না। জলধরদাদা অনুরোধ করিয়া, এমন কি অনেকসময় জোরজবরদস্তী পর্যন্ত করিয়া তাঁহাকে দিয়া লেখাইতেন। জলধরদাদা না হইলে শরৎবাবুর অনেক উপন্যাস শেষ হইত না।"[৬১]

যথার্থই সাহিত্যিকদের পৃষ্টপোষক ও অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবে জলধর সেন স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ-সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপরিসীম উদার ও আন্তরিক। সমালোচকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে প্রতিশ্রুতিশীল নবীন লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের রচনা কখনো কখনো মার্জনা-সংশোধন করে নিজের সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। কল্লোল-যুগের অন্যতম ঋত্বিক্ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন নবীন লেখক-দের প্রতি জলধরের প্রীতি, অনুরাগ, আনুকূল্য ও পক্ষপাতিত্ব কেমন ছিলো:

> ওদিকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল "ভারতবর্ষ"—কাটতির জনশ্রুতি পরিস্ফীত। আশাতীতরূপে সেখানে একদিন ডাক দিলেন জলধর সেন। সবকালের সর্ববয়সের চিরন্তন দাদা। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বলে কোনো ভীরু সংস্কার নেইই বরং যেখানে শক্তি দেখলেন সেখানেই স্বীকৃতিতে উদার-উচ্ছল হয়ে উঠলেন। শুধু পত্রিকায় জায়গা করে দেয়া নয় একেবারে হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। . . . . . . ছোটবড় কৃতী-অকৃতী—সকলের প্রতি তাঁর অপক্ষপাত পক্ষপাতিত্ব।[৬২]

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জলধর সেনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একজন তাঁকে তুলনা করেছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৪—১৯২৪)

সঙ্গে। শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে আশুতোষ তাঁর আনুকূল্য-বদান্যতায় যা করেছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে জলধর সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন।[৬৩]

জলধর-সংবর্ধনা-গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) বলেছিলেন :

> জলধর সেন অজাতশত্রু ব্যক্তি, তাঁহার নিষ্কপট ও নির্ব্বিরোধী চরিত্রই তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। লোকের সহিত ব্যবহারে তাঁহার এমন একটু বৈশিষ্ট্য আছে, তদ্দ্বারা, এবং মুখের দুটি কথায় তিনি অপরিচিতকেও নিতান্ত আপনার করিয়া লন। ...... জলধরের ব্যক্তিত্বের একটা দিক তাঁহার লেখায়, কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রতিফলিত—তিনি একজন খাঁটী বাঙ্গালী। এই-খানেই তাঁহার শক্তি—এইখানেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যে নিজ আসন করিয়া লইতে সামর্থ্য হইয়াছেন। ..... বাঙ্গালীর জীবনে যে যুগ চলিয়া গেল বা যাইতেছে, জলধর সেই যুগের শেষ প্রতীক-স্বরূপ।[৬৪]

'খাঁটী বাঙ্গালী'—সব মিলিয়ে জলধর সেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই অভিধাটিই সবচেয়ে যোগ্য ও সার্থক। এই অভিধার বিশ্লেষণেই মানুষ ও শিল্পী জলধরের অন্তর্গত পরিচয় উন্মোচিত।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

জলধর সেন বিরল বাঙালী সাহিত্যিকদের অন্যতম যাঁরা জীবদ্দশাতেই স্বদেশ ও সমাজের নিকট থেকে যোগ্য সম্মান, সমাদর ও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। তাঁর দীর্ঘকালের সারস্বত-সাধনা বিপুলভাবে অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছিল স্বকালেই। বোধকরি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোনো সাহিত্য-সাধক জীবিতকালে এই ধরনের সর্বজনীন স্বীকৃতি ও সম্মাননা লাভ করেননি।

জলধর সেন বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে এইসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। অসংখ্য সাহিত্যসভায় সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র

সহ-সভাপতি (১৩২৯—৩০ ও ১৩৪৩—৪৫) ও বিশিষ্ট সদস্য (১৩৪১), 'রবিবাসরে'র সর্বাধ্যক্ষ (১৩৩৮—৪৫) ও 'গোবর্দ্ধন-সাহিত্য ও সঙ্গীত-সমাজে'র সভাপতি (১৩২৩—৪১) ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্য-সম্মেলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। 'কুমারখালী সম্মিলনী'র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি (১৩২০), তৃতীয় বার্ষিক মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি (১৩২২), বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের রাধানগর-অধিবেশনে (পঞ্চদশ) সাহিত্য-শাখার সভাপতি (৬-৭ বৈশাখ ১৩৩১), জামসেদপুর প্রথম সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি (১৩৩১), কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী-মোহন চক্রবর্তীর চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের সভাপতি (৭ নভেম্বর ১৯২৫), প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ইন্দোর-অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি (পৌষ ১৩৩৫) হিসেবে বরণ করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

জলধর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিপুল সংবর্ধনা-সম্মাননাও লাভ করেন। এরমধ্যে 'গোবর্দ্ধন-সাহিত্য ও সঙ্গীত-সমাজে'র সংবর্ধনা (আষাঢ় ১৩২৯), 'ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী'র সংবর্ধনা (১৩২৯), বাঁ্যাটরা 'পারিজাত সমাজে'র 'জলধর-জয়ন্তী' উদ্‌যাপন (৩১ চৈত্র ১৩৩৮), 'রবি-বাসরে'র সংবর্ধনা (১১ ভাদ্র ১৩৩৯), 'নিখিলবঙ্গ জলধর-সংবর্ধনা' (২—৪ ভাদ্র ১৩৪১) ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সংবর্ধনার (২৮ বৈশাখ ১৩৪২) কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাওড়ার বাঁ্যাটরার 'পারিজাত সমাজের সাহিত্য সংসদে'র পক্ষ থেকে জলধরের বাহাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে 'জলধর-জয়ন্তী, উদ্‌যাপিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫— ১৯৪৬)।

জলধর সেনের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সমারোহের সঙ্গে 'নিখিলবঙ্গ জলধর-সংবর্ধনা'র যে-আয়োজন করা হয় তা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। জলধর-সংবর্ধনা উপলক্ষে তিনদিনে (২—৪ ভাদ্র ১৩৪১/১৯-২১ আগষ্ট ১৯৩৪) অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়। প্রথম দিন ছিলো 'অভিনন্দন সভা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস্‌-চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১—১৯৫৩)। হাওড়ার শালিখা নাট্যপীঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের সূচীতে ছিলো 'সাহিত্য-সম্মেলন'। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই পর্বের

সভাপতি। তৃতীয় দিনে 'প্রীতি-সম্মিলন ও সঙ্গীত জলসা'র আয়োজন হয় কলকাতার আলবার্ট হলে।

এই 'জলধর-সংবর্ধনা'র মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় সাংবাদিক হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের (১৮৭৬—`৯৬২) প্রতিবেদনে:

> প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের ৭৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে গত ২রা ভাদ্র [১৩৪১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা গত মাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার পরদিন সালিখা নাট্যপীঠ (হাওড়ায়) ঐ উপলক্ষে এক সম্মিলন ও তাহার পরদিন আলবার্ট হলে একটি সঙ্গীতসম্মিলন হইয়াছিল।
>
> ২রা ভাদ্রের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পুত্র বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমীদার মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের নেতৃগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব... করিয়াছিলেন।
>
> দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।...
>
> বাঙ্গলার মহিলাদিগের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন—মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসু।
>
> বাঙ্গালী যে বাঙ্গলাসাহিত্যের সেবককে তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে ও দিতে আগ্রহশীল, এই অনুষ্ঠানে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।[৬৪]

এই সংবর্ধনা উপলক্ষে ব্রজমোহন দাশের (১৮৯৭—১৯৪৩) সম্পাদনায় ও প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সহায়তায় "রায়বাহাদুর জলধর সেনের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের শ্রদ্ধা-নিবেদন ও নানা প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন" সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'জলধর-কথা' (আশ্বিন ১৩৪১)।

'জলধর-কথা'য় যাঁরা শুভেচ্ছা-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১—১৯৪৪), সরলা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৮৯৬—১৯৭২), প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬—১৯৩৮), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮—১৯৪২), যদুনাথ সরকার (১৮৭০—১৯৫৮), হরিহর শেঠ (১৮৭৮—১৯৭২), বিধুশেখর ভট্টাচার্য (১৮৭৮—১৯৫৭), অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (১৮৮১—১৯৬৩), অনুরূপা দেবী (১৮৮২—১৯৫৮), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮—১৯৮০), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫—১৯৬৩) ও প্রবোধকুমার সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিতা-প্রশস্তি-রচনাকারদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন মানকুমারী দেবী (১৮৬৩—১৯৪৩), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬—১৯৩৯), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৫), করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮—১৯৪৮), ভোলানাথ মজুমদার, নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮—১৯৭১), কালিদাস রায় (১৮৮৯—১৯৭৫), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও রাধারাণী দেবী (১৯০৪—১৯৮৯)। অভিনন্দন-পত্র রচিত হয়েছিল 'বাংলাদেশের মহিলাগণ', স্বদেশ-বাসীর পক্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানপুর 'প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন', 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ,' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র মেদিনীপুর শাখা, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাশী শাখা, 'জেমসেদ্পুর প্রবাসী সাহিত্যানুরাগী ভক্তবৃন্দ,' খুলনার 'তরুণ সাহিত্য সমিতি', 'দিনাজপুর জিলা সাহিত্যসভা,' 'চট্টগ্রাম ধর্ম্ম ও সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান,' দিনাজপুরের 'আর্য্য পুস্তকাগার,' 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদল,' 'কুমারখালীর অধিবাসীবৃন্দ,' 'চন্দন-নগর পুস্তকাগার', কলকাতার 'সাহিত্য সেবক সমিতি', 'বঙ্গীয় কিশোর ছাত্রদল', কলকাতার 'রবিবাসর,' রানাঘাটের 'বাঘীমন্দির', 'নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইন্সটিটিউট' ও কলকাতার 'কাশীপুর ক্লাবে'র পক্ষ থেকে।

জলধর-সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ শুভেচ্ছায় বলেছিলেন:

যিনি বাংলা সাহিত্যসমাজে আপন স্নিগ্ধ সহৃদয়তাগুণে বর্ত্তমান সাহিত্য-সাধকদের হৃদয় জয় করিয়াছেন সেই প্রবীণ সাহিত্যতীর্থপথিক শ্রীযুক্ত

জলধর সেনের সম্মাননার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট প্রশস্তি পুস্তকে এই কয়েক ছত্র অর্ঘ্যরূপে পাঠাইলাম।

মানকুমারী বসু জলধরের উদ্দেশে কবিতার 'পুষ্পাঞ্জলি' নিবেদন করে লেখেন :

> নিদাঘের তপ্ত শীর্ণ ধরা
> রবি-তাপে দগ্ধশুষ্ক হিয়া,
> তরু, লতা, তৃণ, নদ, নদী'
> খর করে যায় শুকাইয়া।
> হেন দিন আসিয়া আকাশে
> আষাঢ়ের নব জলধর,
> স্নেহের আসার বরষিয়া
> জুড়াইলা দগ্ধ কলেবর।

স্বদেশবাসীর পক্ষ দেকে অগ্রজ বাণীসাধকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা জলধরের জীবন-বৃত্ত বর্ণনায় তাঁর সম্মাননা-সংবর্ধনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিল :

> আমরা মাত্র কয়েকটি সভাসমিতি ও সম্বর্দ্ধনার কথা প্রকাশ করিলাম। সমগ্র বাংলাদেশে কত স্থানে কতবার যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কলিকাতার প্রায় সকল কলেজগুলিতেই জলধরবাবুকে কোন না কোন উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে এবং ছাত্রগণও নানাভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরদিন দারিদ্র্যব্রতী থাকিলেও তাঁহার সম্মান-লাভের কোনদিন অভাব হয় নাই – সারাজীবন ধরিয়া তিনি তাঁহার দেশবাসী সকলের নিকট হইতেই অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং উপযুক্ত সম্মানলাভ করিয়া গিয়াছেন।**

জলধর সেন রাজ-সরকারের সম্মান-স্বীকৃতিও অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯২২ সালের ৩ জুন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে 'রায়বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন। এ সম্পর্কে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা (বৈশাখ ১৩৪৬; পৃঃ ৮২০)

মন্তব্য করেছিল, "তাঁহার মত দরিদ্র সাহিত্যসেবীর পক্ষে এ সম্মানপ্রাপ্তি তাঁহার সাহিত্যসাধনায় চরম সাফল্য বলা যাইতে পারে।"

কিন্তু রাজ-সম্মান অপেক্ষা দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-প্রীতিজাত সম্মান তাঁকে অধিক পরিচিতি ও মর্যাদাবান করেছিল,—সেই সম্মান হলো 'দাদা' উপাধি। রাজশেখর বসু (১৮৮০—১৯৬০) যথার্থই বলেছেন:

> বিদ্যা বা রাজপ্রসাদের নির্দেশক উপাধি অনেকেই পায়, কিন্তু জনসাধারণ একযোগে অন্তর থেকে যা দান করে এমন উপাধিলাভ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাংলাদেশের সমগ্র সাহিত্যসমাজ দাদা উপাধি দিয়ে জলধর সেনকে অন্তরঙ্গ অগ্রণী ব'লে মেনে নিয়েছে। এমন ঘনিষ্ঠ আন্তরিক মর্যাদা আর কোনও সাহিত্যিক পাননি।'[৭]

জলধর নিজেও তাই মনে করতেন। 'পারিজাত সমাজের সাহিত্য সংসদে'র পক্ষ থেকে উদ্‌যাপিত 'জলধর-জয়ন্তী' অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন:

> এতদিন আমি সাহিত্যিকদের দাস-গিরি করিতেছি—তার জন্যে আমি খুব বড় উপাধি—এই স্নেহের উপাধি বহন ক'রে যাবার চাইতে কোন বড় সম্বর্দ্ধনা আছে কি-না আমি জানিনা।[৬৮]

অভিনন্দন-পত্র

১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের করকমলে—

বরেণ্য বন্ধু,

তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।

তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ, আমাদের অকপট মনে ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

বাণীর মন্দির-দ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা, দুর্ব্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়-হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুকজনই না সাহিত্য পূজার বেদী-মূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করেনা, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতোই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।

হে নিরহঙ্কার বাণীর পূজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২

নিখিল-বঙ্গ-জলধর-সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে
পরমপূজ্য-প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য—
শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর—
শ্রীকরকমলে

অভিনন্দন-পত্র

হে ভাবলোকবাসী মহাত্মন্।

নদীয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখরিত, প্রেমপ্লাবিত, শত-ভৃঙ্গ গুঞ্জরিত সরস্বতীর পীঠস্থান; সংস্কৃতচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল; বঙ্গ-সাহিত্যের জন্মভূমি। নদীয়া বিশ্বমানবের মহাপ্রেমতীর্থ। এই মহাতীর্থের পবিত্র ক্রোড়স্থিত কুমারখালী —"গৌরী" সলিলবিধৌতা, পক্ষাকুলকূজনিতা, শস্যশ্যামলা কুমারখালী তোমার জন্মভূমি;—কুমারখালীর উদার নীলাকাশতলে শরতের শেফালিকা-শুভ্র শিশিরসিক্ত তৃণাস্তীর্ণ স্বর্ণভূমি তোমার জন্ম-মৃত্তিকা;—দেবালয়ের শঙ্খ-ঘন্টা-নিনাদিত, "বাউলগীতির" সুধারস-সিক্ত কুমারখালী তোমার শৈশবের ধাত্রী-মা'— যৌবনের শিক্ষয়িত্রী। হে পল্লীর বরপুত্র, তোমার এই শুভ সম্বর্দ্ধনার স্মরণীয় মাহেন্দ্রক্ষণে তুমি আজ ভক্তিনত শিরে প্রণাম কর,—তোমার সাথে আমারও প্রণত হই—তোমার ঐ স্বর্গাদপি গরীয়সী পল্লীজননীর নিত্য উৎসবময় শ্যাম-চরণে। আর সেই সঙ্গে আমরা নগণ্য হইলেও তোমার মাতৃভূমির পুণ্য ধূলায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি বলিয়া তৃপ্তচিত্তে গর্ব্ব অনুভব করি।

হে সিদ্ধ বাণী-তাপস।

শুভ্র শতদলবাসিনী বঙ্গ-ভারতী আজ বিশ্ববন্দিতা। বঙ্গবাণীর অমর বীণার অমৃত ঝঙ্কার শুনিয়া আজ বিশ্ববাসী বিমোহিত। সত্যই এ যুগ বাঙ্গালীর স্মরণী ও বরণীয় যুগ। এ যুগে বাঙ্গলার অতীতের সাহিত্য-রসিকগণের পুঞ্জীভূত সাধনার ফলে এবং বর্ত্তমান সাহিত্য রথীবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যে জাতির পিরামিড্ গড়িয়া উঠিতেছে, তুমি

তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে তোমার সকল শক্তি ভক্তিসহকারে নিঃশেষে দান করিয়াছ ও করিতেছ। তাই তোমার আরাধ্যা দেবী বঙ্গ-ভারতী আজ তোমার এই সম্বর্দ্ধনা-সভামণ্ডপে তাঁহার শত শত ভক্তের সম্মিলিত সুধাকণ্ঠে বসিয়া তোমাকে অমর বর দান করিতেছেন,—তাঁহার মুগ্ধ সেবকগণের সহস্র হস্ত দিয়া তোমার কর-পদ্মে জয়-পত্র অর্পণ করিতেছেন। আজ তুমি সাহিত্য-জগতে অমরত্বপ্রাপ্ত—জয়যুক্ত। হে ঋত্বিক, আমরা তোমার এই জয়ে তোমাকে শ্রদ্ধার স্রক-চন্দনে অভিনন্দন করি।

হে সাহিত্যসুমন্ত।

তুমি একধারে মৌলিক ভ্রমণবৃত্তান্ত-লেখক, কথাশিল্পী, পত্রিকা-সম্পাদক, সুকুমার-সুকুমারীদের পাঠ্য-গ্রন্থকর্ত্তা, সুবাগ্মী ও জীবনচরিতকার। বাগ-দেবীর চিরতপস্বী কাঙ্গাল হরিনাথ তোমার সাহিত্য-গুরু। তাঁহার তপঃক্ষেত্রে তোমার বাণী-মন্ত্রে উপনয়ন হয়। তুমি তাঁহারই হস্তে শুভ্র যজ্ঞোপবীত হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভারতীর পূজাযজ্ঞের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছ। উত্তরকালে তুমি তাঁহারই পবিত্র জীবন-কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া পল্লীর জীর্ণ পূর্ণ কুটীরবাসী চিরদরিদ্র কাঙ্গাল হরিনাথকে বাঙ্গালীর—বাঙ্গালাসাহিত্য-সেবীর মনোমন্দিরে চির-প্রতিষ্ঠ করিয়াছ। তুমি জীবনে কোন দিন 'এই আকাশ যাঁরে, ধ'র্‌তে নারে, তাঁর আকাশে খোঁচা' দিতে হস্ত প্রসারণ কর নাই সত্য, কিন্তু তুমি কাঙ্গাল হরিনাথের আজীবন তপস্যার কথা—আধ্যাত্মিকতার কথা—প্রেমভক্তির কথা—বাউল-সঙ্গীতের কথা কহিয়া আকাশেরও উর্দ্ধস্থিত স্বর্গের রসাল-নন্দনের অমৃত সৌরভ বাঙ্গালার দুঃখতাপ প্লাবিত মৃত্যুময় মৃত্তিকায় ছড়াইয়া দিয়াছ। ইহাতে তোমার গুরু-দেবকে উপযুক্ত শিষ্যের উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে,—সেই ঋষিকল্প সাধু পুরুষের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবির্ভাব ভূমি—তাঁহার চির-তপস্যাপীঠ—তোমার উদয়গিরি কুমারখালীর সহিত বাঙ্গালীর নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিয়া তুমি তোমার মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। রামানন্দ যেমন দেখিয়াছিল,—শ্রীগৌরাঙ্গের—সেই "কাঞ্চন-পঞ্চালিকার" আড়ালে শ্রীকৃষ্ণের "স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতি", আমরাও তেমনি দেখি,—তোমার কৃষ্ণকায় বৃহৎ-বপুর অন্তরস্থ সাহিত্য-প্রতিভার অন্তরালে কাঞ্চন-তনু হরিনাথের স্বর্গীয় দীপ্ত চিত্তলোকের

স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি। আমরা আমাদের দূর পল্লীর ছায়াস্নিগ্ধ পুণ্যক্রোড়ে বসিয়া দেখি,—বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সজ্জিতা, কৃত্রিম শোভাময়ী, কলরব-মুখরা মহানগরীর অশান্ত বক্ষের এক কোণে বসিয়া আমাদেরই জনবিরল নিভৃত পল্লীর—

"তরল জলধর,
বরিখে ঝর ঝর।"

সহর-প্রবাসী হইলেও সহরের স্বভাব তোমাকে গ্রাস করিতে পারে নাই। তুমি চিরকাল পল্লী-মাটির শান্ত-শিষ্ট মা'টির মানুষ। পল্লী-মার প্রতি তোমার অন্তরের আকর্ষণ অকৃত্রিম। তোমার পল্লীমাতৃকার বুকের স্নেহ-দরদ তোমার এই বিপুল সম্বর্দ্ধনা-প্রাঙ্গণে বুকে করিয়া বহিয়া আনিয়াছি—তোমারই গ্রামবাসী অগণিত ছোট বড়,—হে পল্লীর প্রিয় পুত্র তুমি তোমার বুক দিয়া উহা গ্রহণ কর;—তোমার জননী জন্মভূমির আশীর্ব্বাদ সহস্র হস্তের অঞ্জলি ভরিয়া আনিয়াছি, তুমি উহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর।—আর তোমার সেই সাহিত্য-তীর্থবাসী আত্মীয়স্বজনের—বান্ধব-কুটুম্বের—ভ্রাতা-ভগিনীর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি, অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য তোমার এই বিরাট পূজা-মণ্ডপে আন্তরিকতার সহিত বহন করিয়া আনিয়াছি, হে ভক্তিভাজন, তুমি উহা অন্তর দিয়া গ্রহণ কর। হে বাণীতপঃসিদ্ধ বৃদ্ধ, তোমার চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রাণপাত।

শিবমস্তু

ভবদীয় স্নেহমুগ্ধ—

শ্রীরেবতীমোহন সাহা	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাহা.	শ্রীনন্দগোপাল কুণ্ডু,
শ্রীশারদাপ্রসাদ চাকী,	শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী,
মহম্মদ মজিবর রহমান	শ্রীভোলানাথ মজুমদার

প্রভৃতি কুমারখালীর অধিবাসীবৃন্দ।

কুমারখালী, (নদীয়া) ২রা ভাদ্র, ১৩৪১।

শেষজীবন ও মৃত্যু

শেষজীবনে জলধর সেন বার্ধক্যজনিত নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি কানে কম শুনতেন, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। এই পর্যায়ে কাজে-কর্মে অপরের সহায়তা প্রয়োজন হতো। তবুও 'ভারতবর্ষে'র কাজে ও সভা-সমিতিতে নিয়মিত যোগ দিতেন। কুমারখালীতে জমি সংগ্রহ করে একটি পাকা বাড়ী তৈরী করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'হিমালয়'।[৬৯] ইচ্ছে ছিলো জীবনের শেষ দিনগুলো এখানেই কাটাবেন। কিন্তু যেহেতু মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের যোগ ছিন্ন হয়নি, তাই জন্মপল্লীতে অবসর-যাপনের সেই ইচ্ছে আর পূরণ হয়নি।

১৩৪৫ সালের ৮ মাঘ জলধরের দ্বিতীয়া পত্নী হরিদাসী পরলোকগমন করেন। পত্নীবিয়োগে জলধর মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়:

> গত ৮ই মাঘ রত্রিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা হইলে তাঁহার শরীর যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর সুস্থ হইলনা। তিনি একমাসকাল অসীম ধৈর্য্যের সহিত শোকাবেগ ধারণ করিয়া সমারোহের সহিত পত্নীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অশৌচান্তের দিন অপরাহ্নে তিনি শেষবার ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে পদার্পণ করেন। পরের দুইদিন শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন উপলক্ষে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং নিয়মভঙ্গের দিন বিকালে তিনি যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। দুর্ব্বল অশক্ত শরীর লইয়াও তিনি ৫ই চৈত্র 'রবিবাসর' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং ৬ই চৈত্র তাঁহার বৈবাহিক মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন; তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, তাহা কেহ কল্পনাও করেন নাই।[৭০]

পত্নীবিয়োগের আড়াই মাস পর জলধর সেন ১৩৪৫ সালের ২৬ চৈত্র (১৫ মার্চ ১৯৩৯) রবিবার বিকেল তিনটার সময় তাঁর কলকাতার বাগ-বাজারের নন্দলাল বসু লেনের বাসাবাড়ীতে পরলোকগমন করেন। তাঁর

বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর ২৫ দিন। মৃত্যুকালে তিনি সাতপুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। পুত্রেরা সকলেই তখন প্রতিষ্ঠিত, চার কন্যাই বিবাহিতা —সংসারে প্রতিষ্ঠিতা।

জলধর সেনের মৃত্যুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শোকসভার আয়োজন করে। পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশিত হয়, সম্পাদকীয়-নিবন্ধ ও বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। 'ভারতবর্ষ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) পত্রিকা 'জলধর স্মৃতি-তর্পণ' শিরোনামে সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শোকবাণী, স্মৃতিচর্চা ও স্মরণ-কবিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করে। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), রাজশেখর বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), স্যার লাল-গোপাল মুখোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয়চাঁদ মাহতাব (১৮৮১-১৯৪১), অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯০৪-১৯৬৪), বিমলশঙ্কর দাশ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭), প্রফুল্লকুমার সরকার, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকলতা ঘোষ, কাদের নওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৬), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৩৯), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, বিশ্বেশ্বর দাশ ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০)। রবীন্দ্রনাথ ২৬ এপ্রিল ১৯৩৯ পুরী থেকে 'জলধর' নামে একটি চতুষ্পদী পাঠিয়ে জলধর সেনের প্রতি শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করেন:

> বাঙালীর প্রীতি অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
> স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
> আজি সংসারের পারে, দিনান্তের অস্তাচল হোতে
> প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে।।

লেখক-জীবন ও গ্রন্থ-পরিচিতি

প্রেরণার-পটভূমি

কুমারখালীতে কাঙাল হরিনাথ সংস্কৃতিচর্চার এক অনুকূল আবহ রচনা করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, দীনেন্দ্রকুমার রায় ও জলধর সেন ছিলেন এই কাঙাল-মণ্ডলীর সদস্য। জলধর জন্ম থেকেই কাঙালের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ। শৈশবে কাঙালের তত্ত্বাবধানেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন। কবিতা আবৃত্তি ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ তিনিই সঞ্চারিত করে দেন জলধরের মনে। একবার তিনি হরিনাথের নির্দেশে স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭--১৮৯৪) কুমারখালী বঙ্গবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৮৬)-বিরচিত 'মিত্রবিলাপ' থেকে 'করুণরসাত্মক' আবৃত্তি করে তাঁর চোখের জল টেনে বার" করে "তাঁর কাছ তিনখানা বাঙ্গলা বই তখনই পুরস্কার আদায়" করেছিলেন।[৭১] স্কুলে জলধর গণিতে খুব কাঁচা থাকলেও সাহিত্যে বিশেষ দখল ছিলো তাঁর। বলেছেন তিনি:

> বাঙ্গলা স্কুলে আমি বাঙ্গলা সাহিত্যে খুব কৃতী হয়ে উঠলুম। অবশ্য সেটা আমার নিজের গুণে যত না হউক, কাঙ্গাল হরিনাথের আশীর্বাদে আর তাঁর শিক্ষার গুণে। আমি সে সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করলেও, বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু বাঙ্গলা স্কুল কেন, ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণেরও অগ্রগণ্য ছিলাম। সব গোল বাধিয়েছিল ঐ অঙ্ক-শাস্ত্র। . . . সকলেই বলতেন যে, আমার দেহের গঠনের অনুপাতে মাথাটা নাকি বড় ছিল। সে মাথার ভেতর বোধহয় বাঙ্গলা সাহিত্যই সবখানি যায়গা জুড়ে বসেছিল।[৭২]

এইভাবে কাঙাল হরিনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মায়।

জলধরের লেখকজীবনের সূচনা 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এইসময়ে সোমপ্রকাশে'ও মাঝে-মধ্যে তিনি লিখতেন। এরপর যখন হরিনাথের নিকট থেকে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন পত্রিকার প্রয়োজনে নিয়মিত সম্পাদকীয়, সংবাদ ও নিবন্ধ রচনা কর'তে হতো। কিন্তু দু'বছর পর 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হয়ে গেলে তখনকার মতো তাঁর লেখালেখিতেও ছেদ পড়ে। তাঁর লেখকজীবনের উন্মেষ-পর্বের কথায় জলধর স্পষ্টই বলেছেন: "আমি আমার সাহিত্যসেবায় প্রেরণা পেয়েছিলাম কাঙাল হরিনাথের কাছে। আর সুযোগ পেয়েছিলাম—'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র মধ্য দিয়ে।"[৭৩]

তবে জলধরের প্রকৃত সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয় এরও অনেক পরে। হিমালয়-ভ্রমণ শেষে মহিষাদল রাজ-স্কুলে শিক্ষকতার কালে প্রধানত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উৎসাহ ও উদ্যোগে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত্র এবং তা পাঠকসমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। মহিষাদলে 'মৃৎ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একখানি খড়ের ঘরে' দীনেন্দ্রকুমার ও জলধব একসঙ্গে থাকতেন। দীনেন্দ্রকুমারের ভাষায় "আমি তাঁহার নিকট গণিতবিদ্যা শিখিতাম বটে কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না।"[৭৪] জলধরের সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের সাক্ষ্য দিয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার এইভাবে:

> 'ভারতী'তে নূতন কি লেখা যায়—এ বিষয় লইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের আলোচনাও চলিত। কিছুদিন পরে জলধরবাবুর দপ্তর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এক অপূর্ব্ব দ্রব্য আবিষ্কার করিলাম। একখানি বাঁধানো, খাতা—তাহার একদিকে ফিকিরচাঁদ ফকিরের কয়েকখণ্ড গীতাবলী,—'কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্র' হইতে প্রকাশিত, অন্যদিকে তাঁহার স্বলিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,—জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পেন্সিলে লেখা—মোটা মোটা অক্ষর। . .সেই ভ্রমণকাহিনী আগাগোড়া পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, জলধরবাবুর হিমালয়-পর্যটন উপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন: কতকটা ডায়েরীর ধাচে লেখা। . . . তথাপি তাঁহার সেই ভ্রমণ-কাহিনীতে' নূতনত্ব থাকায় আমার বড়ই ভাল লাগিল.... ।[৭৫]

দীনেন্দ্রকুমারের আগ্রহ ও মধ্যস্থতায় এই হিমালয়-কাহিনী ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়। এই লেখা তাঁকে অসামান্য খ্যাতি এনে দেয়। অনুপ্রাণিত জলধর বলেছেন, "সম্পাদিকা মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে; এই সংবাদ তিনি পাইয়াছেন।. . . সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতী'তে লিখিতে লাগিলাম।"[৭৬]

দীনেন্দ্রকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় ". . . হিমালয়ের মত অতবড় কেতাব, কেবল তাঁহার ডায়েরীর অস্থি-কঙ্কালের উপর, আমার ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে আস্মানের কেল্লার মত ধীরে ধীরে গড়ে উঠিল"[৭৭] বলে 'হিমালয়' রচনায় যে গৌরব দাবী করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই পর্যায়ে তিনি যে জলধরকে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, মনোগ্রাহী হিমালয়-কাহিনী বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন স্বাদ ও ধারার প্রবর্তনা করেছিল। তাই অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল যে, "জলধর সেন নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছদ্মনামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন।"[৭৮] মূলত এই হিমালয়-ভ্রমণকথা নিয়েই বাঙলা সাহিত্যে জলধরের যথার্থ প্রবেশ। এই লেখার মাধ্যমেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং লেখক হিসেবে স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

হিমালয়-কাহিনী প্রকাশের কালে জলধর মহিষাদলে ছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণ-কথা যখন পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে, তখন বাল্যসুহৃদ অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় 'ছাত্র ঠেঙ্গাইয়া' যাতে জলধরের সাহিত্যপ্রতিভা নষ্ট না হয় সেজন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। অক্ষয়কুমারের সৌজন্যেই কলকাতায় 'সাহিত্য'-গোষ্ঠীর সঙ্গে জলধরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর গৃহেই থাকার ব্যবস্থা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সুরেশচন্দ্রের উদ্যোগে জলধরের গ্রন্থ-প্রকাশ ও সাংবাদিকতা-পেশায় যোগদান সম্ভব হয়। এ-বিষয়ে বিশিষ্ট পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৭-১৯১৮) ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এরপরের ইতিহাস জলধরের প্রতিষ্ঠা আর সাফল্যের ইতিহাস।

সব্যসাচী লেখক ছিলেন জলধর। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাকেই তিনি স্পর্শ করেছেন। গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, ভ্রমণকাহিনী

রচনা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, মনীষী-জীবনকথা রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, স্মৃতিচিত্র আত্মজীবনীর খসড়া উপহার দিয়েছেন, সংকলন-সম্পাদনা করেছেন গ্রন্থ, অনুবাদকর্মে হাত দিয়েছেন, শিশুতোষ কিংবা স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তাঁর মনোযোগ-লাভে ব্যর্থ হয়নি। কেবল কবিতা ও নাটক— এই দুই ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগের কোনো পরিচয় নেই। কবিতা না-লেখা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন:

> আমি বাল্যকাল থেকেই কাঙ্গাল হরিনাথের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁরই আদেশে আমি যখন যে কবিতার বই পেয়েছি তার আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি। বহুদিন পর্যন্ত আমার এ অভ্যাস ছিল; ইংরেজী ও বাংলা করিতা যে কত কণ্ঠস্থ করেছিলাম, তার হিসাব দিতে পারিনে; অথচ আমি হলফ করে বলতে পারি, এই, সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোনদিন দুই লাইন কবিতাও লিখতে পারিনি।[৭৯]

অন্যত্রও একটু কৌতুক-রঙ্গ করে বলেছেন:

> দিব্য করে বলতে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে কোনও দিন কবিতা লেখারূপ দুষ্কর্ম আমার দ্বারা কৃত হয়নি।[৮০]

তবে তাঁর 'দুঃখিনী' উপন্যাসের উৎসর্গ-পত্রে অকালপ্রয়াত অনুজ শশধরের উদ্দেশ্যে চতুর্দশ পংক্তির একটি পদ্য স্থান পেয়েছে। বলা যায় এটিই জলধরের মুদ্রিত একমাত্র কবিতা। ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে স্মরণ করেছেন স্নেহাস্পদ অনুজকে:

ভাই।

পঞ্চদশী বয়সের তুচ্ছ আঁকিবুকি
আমার 'দুঃখিনী',—তাই ছাপাইয়া সুখী
চেয়েছিলে হ'তে ভাই। হিজিবিজি লেখা
কোথায় পড়িয়াছিল অযতনে একা
বিস্মৃত খেয়াল সম। ধূলি ঝাড়ি তার
তুমিই ত 'দুঃখিনীরে' করিলে উদ্ধার
অপঘাত মৃত্যু হ'তে। পরেরে বাঁচায়ে,
আপনারে ডালি দিলে মরণের পায়ে।

'দুঃখিনী' প্রকাশ হ'ল—তুমি নাই কাছে,
তব স্নেহছায়া সম ফিরে তার পাছে।
ভুলিনি অন্তিম সাধ—দাদা। দুঃখিনীরে
মেজে ঘসে রং দিয়ে এনো না বাহিরে।"
অনাঘ্রাত কুসুমের আদিম সজ্জায়,
সে লুকাবে তোরি বুকে সোহাগে লজ্জায়।

ভ্রমণ-সাহিত্য

জলধর সেনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে তাঁর ভ্রমণকাহিনী। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতি অনুসরণ করে এই ভ্রমণ-কথা রচনা করেন। তাঁর ভ্রমণসাহিত্যভুক্ত গ্রন্থগুলো হলো 'প্রবাসচিত্র', 'হিমাল', 'পথিক', 'হিমাচল-বক্ষে,' 'পুরাতন পঞ্জিকা', হিমাদ্রি' আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ' (বর্দ্ধমানের মহারাজ 'Impressions' গ্রন্থের অনুবাদ), 'দশদিন, 'মুসাফির-মঞ্জিল', 'দক্ষিণাপথ', 'মধ্যভারত' ও 'হিমালয়ের স্মৃতি'।

জলধর-সাহিত্যের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে সকলেই তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বাঙলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন যে এই ভ্রমণকাহিনীর জন্যই, সে-মন্তব্যও করেছেন। হিমালয়-কাহিনীর 'ঐতিহ্য প্রবর্তনে'র কৃতিত্ব তাঁরই, এ-বিষয়ে 'অগ্রপথিকের মর্যাদা' ও তাঁর প্রাপ্য।[৮১] তাঁর ভ্রমণ-কথা যে সেকালে পাঠকের মনে কী গভীর দাগ কাটতে ও আবেদন-সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল তার উল্লেখ বিভিন্নজনের লেখায় পাওয়া যায়। প্রফুল্লকুমার সরকার বলেছেন:

> জলধর সেনের পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষায় ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেকে লিখিয়া-ছিলেন। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীকে যেরূপে প্রাণময় ও সরস করিয়া তুলিতে হয়, তাহাকে উচচশ্রেণীর সাহিত্যে উন্নীত করা যায়, জলধর সেনই বোধহয় প্রথম সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।[৮২]

জলধর সেনের আর-এক গুণগ্রাহী হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) উল্লেখ করেছেন:

> 'ভারতী'তে শ্রদ্ধাস্পদ জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণ সাগ্রহে পাঠ করতুম। 'প্রদীপ' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিকপত্রেও তাঁর আরো

> অনেক ভ্রমণকাহিনী আমাকে বাস্তব রূপকথার মতন আনন্দ দিত। তার আগেও বাংলাভাষায় আরো অনেক ভ্রমণ-কাহিনী বেরিয়েছে, কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতরে যে কতখানি মৌলিকতা, সরল লেখার কায়দা, তাজা আনন্দ ও আন্তরিকতা এবং উপন্যাসের উত্তেজনা থাকতে পারে, জলধরবাবুর রচনাগুলিই বাঙালীকে সর্ব্বপ্রথমে তা দেখিয়ে দিলে।[৮৩]

জলধরের ভ্রমণ-সাহিত্য যে-কেবল সহৃদয় পাঠককে মুগ্ধ ও আনন্দিত করেছে তাই নয়, অনেক ভ্রমণ-কাহিনীকারের প্রেরণা ও আদর্শ হিসেবেও গৃহীত হয়েছে। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬২—১৯৩৫) সবিনয়ে স্বীকার করেছেন, "ভ্রমণ-বিবরণ-কথা-সাহিত্যে আমি তাঁহার অযোগ্য অনুবর্তী"।[৮৪] বাঙলা ভ্রমণসাহিত্যে জলধরের স্থান সম্পর্কে জ্যোৎস্নানাথ চন্দ মন্তব্য করেছেন:

> চশারকে যদি Father of English prose বলতে হয় তো জলধর সেনকেও বাঙলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীর স্রষ্টিকর্তা বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।[৮৫]

ছোটগল্প

জলধরের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর ছোটগল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। "বাংলাসাহিত্যে যাঁরা সর্ব্বপ্রথম ছোটগল্পের প্রবর্তনা করেন সেই দু'তিনজন আদিপুরুষের মধ্যে তিনি একজন।"[৮৬] 'নৈবেদ্য' নামে তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে (১৩০৭ বা.)। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থের নাম 'ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প', 'নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প', 'পুরাতন পঞ্জিকা' (গল্প ও ভ্রমণ), 'আমার বর ও অন্যান্য গল্প', 'পরাণ মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প', 'আশীর্ব্বাদ', 'এক পেয়ালা চা', 'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'মায়ের নাম' ও 'বড়মানুষ'। 'কিশোর' ও 'মায়ের পূজা' নামে কিশোরপাঠ্য গল্প-সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছিল।

জলধরের গল্পে মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন বলেছেন:

> প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পল্লী-জীবনের কাহিনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের

সুখদুঃখের কথা এমন বেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে তিনি গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পাঠকের মনে তাহার প্রতিধ্বনি না জাগিয়া পারেনা। পল্লীজীবনের সঙ্গে, দরিদ্র জীবনের সঙ্গে জলধরদাদার নিবিড় পরিচয় ছিল বলিয়াই তাঁহার রচিত গল্প ও উপন্যাসের মানুষগুলি এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সরল ও মধুর প্রকৃতির মত তাঁহার ভাষা ও রচনার মধ্যেও একটা নিজস্ব সারল্য ও মাধুর্য্য ছিল।[৮৭]

জলধরের ছোটগল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন:

আঙ্গিকের দিক থেকে নিছক বর্ণনাধর্মী হলেও, জলধরের রচনায় জীবনানুভবের এক বিশিষ্ট স্বাদুতা রয়েছে। অবশ্য সে আস্বাদন শিল্পকর্মের নয় ততটা, যত শিল্পি-ব্যক্তিত্বের। সমসাময়িক জীবন-জটিলতার ভারে এই ব্যক্তিত্ব কৌতূহলজনকভাবে পরস্পর-বিরোধীও হয়ে উঠেছে,—অথচ সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে এক আশ্চর্য অখণ্ডিত মানবিক সহানুভূতির দ্যুতি। বাঙালি সমাজের এক যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে জলধরের মধ্যে নমস্কার-ধর্ম ও হৃদয়-ধর্মের এক লুকোচুরি খেলা চলেছে যেন,—যার মধ্যে আছে আবেগস্নাত প্রসন্ন উদারতা।[৮৮]

জলধরের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকীতে কানপুরের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'অভিনন্দন-পত্রে' "'নতুন কিছু' করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া 'অভাগী'দের কাহিনীকে আপনি সহজ সরল ভাষায় মূর্ত্ত করিয়াছেন ছোটগল্পে"[৮৯] —বলে যে মন্তব্য করা হয় তা অসত্য বা অত্যুক্তি ছিলো না।

উপন্যাস

'দুঃখিনী', 'বিশুদাদা', 'করিম', 'বড়বাড়ী', 'হরিশ ভাণ্ডারী', 'ঈশানী', 'পাগল', 'চোখের জল', 'ষোল-আনি', 'সোনার বালা', 'দানপত্র', 'পরশ পাথর', 'ভবিতব্য', 'তিনপুরুষ' ও 'উৎস' নামে জলধর সেনের ষোলখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়া 'চাহার দরবেশ' ও 'আলান কোয়াটারমেন' নামে দু-খানা অনুবাদ-উপন্যাসও আছে। মূলত "পল্লীগ্রামের দরিদ্র ভদ্রজীবনের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখবেদনা ইহার গল্প-উপন্যাসের

বিশেষ বস্তু।"[১০] তিনি সরল ভাষায় তাঁর উপন্যাসে 'হিন্দুর অনাবিল জীবন-যাত্রার পরিচয়' আর 'সামাজিক ও সাংসারিক প্রেমের চিত্র' পাঠক-সমাজে তুলে ধরেছিলেন।[১১]

গার্হস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের নিটোল কাহিনী পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর মর্যাদা ও অসহায়ত্ব, অন্তঃপুরের বেদনা এবং পাপ ও পতনের দিকটিও সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিফলিত করেছেন। 'বিশুদাদা' ও 'অভাগী' এ-বিষয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস। উপন্যাসে নারীর বেদনা রূপায়ণ-প্রয়াসে জলধর ছিলেন শরৎচন্দ্রের পূর্বসূরী। এ-বিষয়ে সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীর পক্ষ লইয়া জলধর সাহিত্যের দরবারে নালিশ নহে, ক্ষীণ অনুযোগ তুলিয়াছিলেন। সে কাজ হরিনাথের শিষ্যেরই উপযুক্ত। পতিত নারীর পক্ষ নেওয়াতে জলধরকে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বগামী মনে করিলে ভুল করিব না।[১২]

নারীসমাজের প্রতি জলধরের এই মমত্বপূর্ণ মনোযোগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বাংলাদেশের মহিলাগণ' তাঁর পঞ্চসপ্ততি জন্মবার্ষিকীতে এক আন্তরিক মানপত্র প্রদান করে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলেন:

> ···তুমি সমাজের কীট-জীর্ণ পুঁথির নির্দেশে নারীর সাময়িক ভুলকে অকারণে বড় করিয়া দেখ নাই, অধিকন্তু প্রগাঢ় স্নেহে নির্জীব শুষ্ক সমাজপতিদের অনুশাসন হইতে তাহাদের রক্ষা করিয়া একটা সবল সুস্থ সাহসী মনের পরিচয় দিয়াছ। নারীর ব্যথাবেদনবিষকে তুমি—নারীর মধ্যে 'অভাগী'কে তুমি সকরুণ নিবিড় স্নেহে বুকে ধারণ করিয়া আজীবন দেশের নারীজাতির কল্যাণ কামনা করিয়াছ—হে পুরোমহিলার বান্ধব, তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।[১৩]

জলধরের চরিত্রে বাঙালিয়ানার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁর গল্প-উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে। "আজকালকার ইংরেজীনবীশ ঔপন্যাসিকগণ পরিবেশেন করিতেছেন পুডিং, আর জলধর পরিবেশন করিতেছেন পায়সান্ন"[১৪]—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের এই মন্তব্য, জলধর সেনের উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-বিচারে যথার্থ বলে বিবেচিত হবে।

জীবনী

চরিতকার হিসেবে জলধর সেন স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর সাহিত্য-গুরু কাঙাল হরিনাথের জীবনী ('কাঙ্গাল হরিনাথ') রচনার সূত্রে। দুই খণ্ডে কাঙাল-জীবনী রচনা ছাড়াও তিনি কাঙাল সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেন। এ-ছাড়া তাঁর জীবনী-মূলক প্রবন্ধের মধ্যে আছে— 'রজনীকান্ত সেন' ('জাহ্নবী', পৌষ ১৩১৯), 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' ('ভারতবর্ষ' শ্রাবণ ১৩২০), 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' (ঐ, ভাদ্র ১৩২২), 'অশ্বিনীকুমার দত্ত' (ঐ, কার্তিক ১৩৩৬) ইত্যাদি। জলধর-রচিত 'কাঙাল-চরিত' বঙ্গ-দেশের বৃহত্তর পাঠকসমাজকে হরিনাথের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এতে যে কাঙালের পরিচয়ের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে কোনো সংশয় নেই। বাঙলা চরিত-সাহিত্যে জলধরের 'কাঙ্গাল হরিনাথ' একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে সম্মানিত।

আত্মজীবনী

জলধর সেন তাঁর বিস্তৃত কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ আত্মচরিত রচনা করেননি। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও আরো কয়েকজনের অনুরোধে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৪২ হতে ভাদ্র ১৩৪৩) মোট এগারো কিস্তিতে এগারোজন ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে ('স্মৃতি-তর্পণ' নামে খণ্ড স্মৃতিচিত্র) প্রকাশ করেন। এই স্মৃতিচিত্র যে কিছুটা অসংলগ্ন ও ধারাবাহিকতাহীন এবং সাল-তারিখের গরমিলমুক্ত নয়, সে-কথা তিনি ভূমিকাতেই বলে নিয়েছেন। অসম্পূর্ণ হলেও জলধরের এ 'স্মৃতি-তর্পণে' তাঁর কালের সমাজ-সংস্কৃতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত হইয়াছে। সমাজচিত্র হিসেবেও এই রচনার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এই প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা সংক্রান্ত তাঁর দুটি স্মৃতিচারণার কথাও উল্লেখ-যোগ্য: 'ভারতী-স্মৃতি' ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৩) ও 'ভারতী-আরতি' ('ভারতী', বৈশাখ ১৩৩৩)।

জলধর সেনের আত্মজীবনী' নামে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথা রচিত হয় নরেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৯০—১৯৬৪) সহায়তায়। এতে তাঁর জীবনের 'শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে'র কথা বিবৃত হয়েছে। একে ঠিক আত্মজীবনী না বলে আত্মজীবনীর খসড়া বলাই সমীচীন। এই সংক্ষিপ্ত

আত্মকথা আর পূর্বোক্ত 'স্মৃতি-তর্পণ' ও 'ভারতী'-সম্পর্কিত স্মৃতিকথা-মিলিয়ে মোটামুটিভাবে আত্মজীবনীর একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। জলধরের জীবনকাল দুটি শতাব্দীকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতার সঙ্গে তাঁর ছিলো নিবিড় সংযোগ। তিনি একদিকে যেমন তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী-ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন, অপরদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। তাই তিনি যদি একটি শৃঙ্খলা-শাসিত পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী রচনা করে যেতেন তা হতো কালের অমূল্য দলিল ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

শিশুতোষ ও বিদ্যালয়-পাঠ্য রচনা

জলধর সেন জীবনী-গল্প-ভ্রমণকথা মিলিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্যও বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখিত তাঁর সব বইয়ের নাম-পরিচয় জানা যায় না। 'সীতা দেবী', 'কিশোর', 'শিব-সীমন্তিনী', 'মায়ের পূজা', 'আফ্রিকায় সিংহ শিকার', 'রামচন্দ্র', 'আইসক্রীম সন্দেশ', 'ভারতী' ইত্যাদি বই এই পর্যাবের অন্তর্ভুক্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) এ-ছাড়া 'সাথী', 'সন্দেশ' ও 'ফটিক' নামে আরো তিনটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 'হিমাদ্রি' নামে 'হিমালয়' গ্রন্থের একটি কিশোর-সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুতোষ সাহিত্যরচনার বিষয়ে জলধরের বিশেষ আগ্রহ ছিলো। 'ধ্রুব' পত্রিকার সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ জানাচ্ছেন:

> ... ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে আমার 'ধ্রুব' বাহির হয়। 'ধ্রুব' একটু বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। 'ধ্রুব'র পরিকল্পনার কথা শুনিয়া যাঁহারা ঐরূপ একখানি পত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়া উহার অনুমোদনপূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত জলধর সেন দাদামহাশয়ের নাম করিতে হয়।[৯০]

শুধু পত্রিকা প্রকাশেই তিনি প্রেরণা জোগাননি, শিশুকিশোরদের জন্য এই পত্রিকায় প্রায়-নিয়মিত লিখেছেনও। ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত শিশু-পত্রিকা 'সখা ও সাথী'-তেও জলধরের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৯১]

শিশুতোষ গল্পের পাশাপাশি জলধর বেশ কয়েকটি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। অবশ্য প্রকারান্তরে এগুলোও শিশুতোষ রচনার পর্যায়েই পড়ে। তাঁর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আছে 'বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ', 'প্রথম শিক্ষা', শিশুবোধ', 'নবীন ইতিহাস', 'বঙ্গ-গৌরব', 'অমিয়পাঠ' ইত্যাদি। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হককে (১৮৬০—১৯৩৩) লেখা এক পত্রে তাঁর 'সোপান' নামে একটি পাঠ্য বইয়ের উল্লেখ পাই। তিনি মোজাম্মেল হককে অনুরোধ করেছিলেন যাতে এই বইটি মাধ্যমিক স্কুলে পাঠ্য হিসেবে মনোনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মোজাম্মেল হকের ভ্রাতুষ্পুত্র স্যার মোহাম্মদ আজীজুল হক (১৮৯২--১৯৪৭) তখন সেকেণ্ডারি স্কুল টেক্সট বুক কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।[২৭]

প্রবন্ধ ও নক্‌শাজাতীয় রচনা

জলধর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করলেও তা গ্রন্থভুক্ত হয়নি। তবে স্মৃতিচিত্রধর্মী নক্‌শাজাতীয় রচনা নিয়ে 'সেকালের কথা' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। জলধরের স্মৃতি ও শ্রুতিতে উজ্জ্বল কয়েকটি প্রসঙ্গ বা ঘটনার চালচিত্র এই রচনায় ফুটে উঠেছে। জলধরের অগ্রন্থিত প্রবন্ধের মধ্যে আছে সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনা, অভিভাষণ, ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক রচনা, নক্‌শাধর্মী রচনা, গ্রন্থ-সমালোচনা ইত্যাদি। এর মধ্যে ইতিহাস-বিষয়ক রচনায় এ-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব রচনার মূলে হয়তো তাঁর ঐতিহাসিক-বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রেরণা ও প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

সম্পাদিত গ্রন্থ

'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' (১ম ভাগ) ও 'প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী' (১ম-৩য় ভাগ) জলধর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বদেশী গানের একটি সংকলনও, 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' নামে, তিনি সম্পাদনা করেন। এ-ছাড়া কাঙাল হরিনাথের 'বিজয়-বসন্ত' ও 'বাউল সঙ্গীত'ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। হরিনাথ ও প্রমথনাথের গ্রন্থ সম্পাদনায় তিনি একই সঙ্গে সাহিত্যিক কর্তব্য ও ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

অগ্রন্থিত রচনা

জলধরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যা কম নয়। তাঁর মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে জানা যায়:

> তিনি বহু সাময়িক পত্রিকায় কত যে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। যে কোন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক জলধরবাবুর নিকট লেখা চাইতেন, তাঁহার জন্যই তিনি কিছু না কিছু লিখিয়া দিতেন। পূজার সময় তাঁহাকে ২৫/৩০টি প্রবন্ধ বা গল্প রচনা করিতেও হইয়াছে। ভারতী, সাহিত্য, জহ্নবী, মানসী, ভারতী ও বালক, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ধ্রুব, বার্ষিক বসুমতী, নিরুপমা, বর্ষ-স্মৃতি, ঋষি প্রদীপ, দাসী, অর্চ্চনা, নারায়ণ, বাঁশরী, পঞ্চপুষ্প, যমুনা, নির্ম্মাল্য, মাধবী প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৬ বৎরকাল শুধু ভারতবর্ষেই তাঁহার অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।[১৮]

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৮৮২--১৯৪০) 'জলধর-কথা'য় সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জলধরের রচনার একটি বিস্তৃত তালিকা-বিবরণ প্রদান করেছেন। বলা-বাহুল্য এই তালিকাও অসম্পূর্ণ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত জলধরের অগ্রন্থিত রচনা সংকলন-সম্পাদনা করে একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁর পৌত্র অধ্যাপক কাজল সেন।

গ্রন্থ-পরিচিতি

জলধর সেনের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তাঁর প্রায় সব গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। একদা জন-নন্দিত এই লেখকের গ্রন্থ-প্রকাশে এখন আর কোনো প্রকাশনা-সংস্থার আগ্রহ বা মনোযোগ নেই। প্রকাশকের আনুকূল্যলাভে বঞ্চিত বিগতকালের লেখক কেবল উত্তরকালের স্মৃতি-শ্রুতিতেই বেঁচে থাকেন, তারপরে এক সময়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যান। হয়তো জলধরের গল্প-উপন্যাসের চাহিদা বর্তমানকালে আর নেই, অতীত বিষয় আর প্রাচীন বাণীভঙ্গির কারণে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব-সমাদর প্রত্যাশা করা চলে না। কিন্তু 'ধ্রুপদী-সাহিত্য' হিসেবে সম্মানিত তাঁর

হিমালয় ভ্রমণ-কথা সম্পর্কে এই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত মানা চলে না। সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি উপেক্ষিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০২–১৯৭০) সুবিপুল গ্রন্থ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় তিনি দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত।

জলধরের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সব বইয়েরই প্রচ্ছদ বা আখ্যাপত্র ছিন্ন। তাই প্রকাশনা-সংক্রান্ত তথ্য উদ্ধার করা দুরূহ, তবুও আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জলধরের প্রকাশিত বইয়ের বিষয়ওয়ারি যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ এখানে পেশ করছি।[৯৯]

গল্প

১. নৈবেদ্য।[১০০] প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১৪। গল্প: অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা কোথায়?, অদৃষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী।

'জলধর গ্রন্থাবলী'র (২য় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) পরিশিষ্টে জলধরের 'পুস্তক-পরিচয়' বিজ্ঞাপনে এই বই সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে: "জলধরবাবু যখন তাঁহার অতুলনীয় হিমালয়, প্রবাসচিত্র প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনী লেখেন, সেই সময় অবসরকালে যে কয়েকটী ছোটগল্প লিখিয়াছেন, তাহা দিয়া এই নৈবেদ্য সাজাইয়াছিলেন—ইহা নৈবেদ্যের মতই পবিত্র সুরভিপূর্ণ।" এই বিজ্ঞাপনে 'নৈবেদ্যে'র তৃতীয় সংস্করণের (মূল্য আট আনা) উল্লেখ আছে।

২. ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প। প্রকাশকাল: ১০ অক্টোবর ১৯০৪। মূল্য: আট আনা (৩য় সং)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১৬। গল্প: ছোটকাকী, মোহ, ডিপুটিবাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমণী, সমাজ-চিত্র, কবি, মৃতের মৃত্যু, মামাবাবু। শেষের গল্প দু'টি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা।

'জলধর গ্রন্থাবলী'র (২য় খণ্ড) পরিশিষ্টে এই বই (৩য় সং) সম্পর্কে বলা হয়েছে: "গৃহস্থ-ঘরের দুঃখের কাহিনী পড়িয়া যদি কেহ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে ছোটকাকী পড়ুন। একটী গল্প আরম্ভ করিলে সবগুলি শেষ না করিয়া থাকা যায় না—এমনই প্রাণঢালা গল্পগুলি।"

৩. নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প। প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩১৪ (১ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১৭। গল্প: নূতন গিন্নী, জুনিয়ার উকীল, কালো মেয়ে, মেয়ে লাথি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রামঠাকুর, রঘুনাথ।

দ্বিতীয় সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। তৃতীয় সংস্করণ: ভাদ্র ১৩২৭। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য: বারো আনা (কাপড়ে বাঁধাই)/আট আনা (কাগজে বাঁধাই)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৬+৯৮। উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ, মহাশয় করকমলেষু।

৪. পুরাতন পঞ্জিকা। প্রকাশকাল: সন্তোষ (ময়মনসিংহ), ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৩২। গ্রন্থটিতে শেফালি-কার দুঃখ, বিবাহের ফর্দ্দ, চিতার আগুন—এই তিনটি গল্প আছে। এ ছাড়া ভ্রমণ, শিকার-কাহিনী ও হিমালয়-স্মৃতি পর্যায়ে সাতটি রচনা সংকলিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: বারো আনা।

৫. আমার বর ও অন্যান্য গল্প। প্রকাশকাল: ফাল্গুন ১৩১৯ (৫ মার্চ ১৯১৩)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৮৩। গল্প: আমার বর, রাধারানীর ইচ্ছা, পূজার তত্ত্ব, পূজার ভ্রমণ, পিতা-পুত্র, শিবনাথের অধিকার, কন্যাদায়, হরিনাথের পরাজয়, গল্পের মূল্য, মামা-বাবু, বাতাসী।

'জলধর গ্রন্থাবলী'র (২য় খণ্ড) পরিশিষ্টে এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়: "তাঁহার এই গল্পপুস্তক 'আমার বর' ভাষার ললিত-বিন্যাসে, বর্ণনার চারু-চিত্রে, গল্প বলিবার মোহিনী ভঙ্গিতে এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহকে অতিক্রম করিয়াছে...। জলধরবাবুর গ্রন্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কপটতা নাই, রসবিকার নাই।"

৬. পরাণ মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩২১ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫৬। গল্প: পরাণ মণ্ডল, শান্তিরাম, পয়লা বৈশাখ, রঘু পাগলা, আর একদিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা যাই, জল—একটু জল, জ্যা কাম করবি নে? না। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: একটাকা চার আনা।

৭. আশীর্ব্বাদ। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগষ্ট ১৯১৬)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৯২। গল্প: আশীর্ব্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার,

ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, দিগম্বর, "লেড়কী মর গেয়ী", কতদূরে, বিধবা, সতীর আসন, দীনের বন্ধু। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: একটাকা চার আনা।

৮. এক পেয়ালা চা। প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩২৫ (৫ অক্টোবর, ১৯১৮)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৯২। গল্প: এক পেয়ালা চা, আমার মাষ্টারী কূপের কথা, নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহৌষধি, তুলসী।

বিজ্ঞাপনের মন্তব্য: "পান করিয়া দেখুন, হৃদয় শীতল হইবে। উগ্রতা নাই, মাদকতা নাই, ঘরের ছেলে কেমন ক্ষণিক মোহে স্বধর্ম্ম, দেশাচার ত্যাগ করিতে যাইয়া, এক পেয়ালা চা দেখিয়া ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ হইয়াছিল, তাহারই করা এই সংগ্রহ-পুস্তকে আছে।" ('জলধর গ্রন্থাবলী' ২য় খণ্ড)।

৯. কাঙ্গালের ঠাকুর। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩২৭ (১৯ আগষ্ট ১৯২০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১৭। গল্প: কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া, কতদূর।, আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান। আট আনা—সিরিজের বই।

১০. মায়ের নাম। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (২০ জুলাই ১৯২১)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৪+১২৩+১। উৎসর্গ: বঙ্গ-সাহিত্যের পরম হিতৈষী, দীনবন্ধু শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও / লালগোলাধিপ বাহাদুরের করকমলে। গল্প: মায়ের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা এবং মোহিতের পরিণাম, বড়-দিদি, অন্তিম প্রার্থনা।

১১. বড় মানুষ। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩৩৬ (৯ অক্টোবর ১৯২৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৮৫। গল্প: বড় মানুষ, স্মৃতি, কবি-ব্যাধি, অদৃষ্টলিপি, সন্ন্যাস, জাতিস্মর, গৃহিণীরোগ, অধঃপতন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, রামলাল, গুরুগিরি, শেষ আদেশ।

উপন্যাস

১. চাহার দরবেশ। উর্দু উপাখ্যানের অনুবাদ। প্রকাশক: বসুমতী কার্যালয়, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩০৬ (১০ মার্চ ১৯০০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৮০।

২. দুঃখিনী। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩১৬ (৩৭ জুলাই ১৯০৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৵০+৮৯। উৎসর্গ: শশধর সেন বি. এ.। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: বারো আনা।

১৮৭৫ সালে মধ্য-ইংরেজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার পর মাত্র ১৫ বছর বয়সে জলধর এই 'দুঃখিনী' উপন্যাস রচনা করেন। এটি তাঁর প্রথম রচনা হলেও প্রকাশিত হয় অনেক পরে। জলধর-সূত্রে জানা যায়: "কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে আমি যখন 'বসুমতী'র সম্পাদক' সেই সময় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা...শ্রীমান শশধর আমাদের বাড়ীর পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেই অমূল্য রত্ন বের করেন এবং আগাগোড়া পড়ে বলেন—'দাদা, এর একবর্ণও সংশোধন করতে পারবেন না—যেমন আছে তেমনি ছাপা হবে।" ('স্মৃতি-তর্পণ'। 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩; পৃঃ ৯০৫)। 'দুঃখিনী' প্রথমে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের উদ্যোগে তাঁর সম্পাদিত 'জাহ্নবী' 'পত্রিকায় বৈশাখ-চৈত্র ১৩১৫) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, পরে ১৯০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৩. বিশুদাদা। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩১৮ (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ২২৪। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য: একটাকা আট আনা।

৪. করিম সেখ। প্রকাশকাল: ১০ আশ্বিন ১৩২৯ (২৪ অক্টোবর ১৯১৩)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৯৭। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য: বারো আনা।

'জলধর গ্রন্থাবলী'র (২য় খণ্ড) পরিশিষ্টের গ্রন্থ-বিজ্ঞাপনের মন্তব্য: "শ্রীযুক্ত জলধরবাবু এতদিন হিন্দু গৃহস্থঘরের কাহিনীই ছোটগল্পে ও উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। দরিদ্র, অনাদৃত, উপেক্ষিত, নিরক্ষর মুসলমান কৃষক-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, গৃহ-পরিবারের কথা এতদিন তিনিও লিপিবদ্ধ করেন নাই, অপর কেহও সে চেষ্টা করেন নাই; জলধরবাবুই এ কার্য্যে এই নূতন ব্রতী হইলেন। তিনি আবাল্য গ্রামবাসী, তিনি দরিদ্রের গৃহস্থালীর কথা, তাহাদের ঘরের কথা সমস্তই জানেন। তাহার পর করুণ কাহিনী লিখিতে বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই জলধরবাবুর লেখনী-

প্রসূত.... 'করিম সেখ' যে গল্প-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসনগ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

৫. আলান কোয়াটার মেন। হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড-রচিত উপ-ন্যাসের অনুবাদ। প্রকাশক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বোম্বাই (?)। প্রকাশকাল: ১৯১৪। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৪৭।

৬. অভাগী (১ম খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩২২ (৭ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৩১১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। অষ্টম সংস্করণপ্রকাশের খবরও পাওয়া যায়।

"আমাদের প্রকাশিত আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালা এই 'অভাগী' দিয়াই প্রথম আরম্ভ হয়। তাহার পর এই সাত-আট বৎসর 'অভাগী'র বহু সহস্র খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে এবং এখনও 'অভাগী'র বিক্রয় সমভাবেই আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে 'অভাগী'র স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই বিক্রয়াধিক্যই প্রমাণ করিতেছে। এমন পাঠক পাঠিকা নাই, যিনি 'অভাগী' পড়িয়া চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারেন;—ইহাই জলধরবাবুর বিশেষত্ব।" ('জলধর গ্রন্থাবলী'—২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট)।

খ. অভাগী (২য় খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: জন্মাষ্টমী ১৩২৯ (২৭ আগষ্ট ১৯২২)। মূল্য: এক টাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৮৪।

"প্রথম খণ্ড 'অভাগী'তে কথা যেখানে শেষ হইয়াছিল, তাহার পরেও অভাগীর জীবনের অনেক কথা বলিতে অবশিষ্ট ছিল; জলধরবাবুর দ্বিতীয় খণ্ড 'অভাগী'তে তাহা বলিয়াছেন; কিন্তু এখনও শেষ করিতে পারেন নাই। এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; এবং পাঠকগণ তৃতীয় খণ্ডের জন্য উৎসুক হইয়া আছেন—এমনই সুন্দর ঘটনা-সংস্থান; এমনই মর্মভেদী করুণ কাহিনী।" ('জলধর গ্রন্থাবলী'-২য় খণ্ড পরিশিষ্ট)।

গ. অভাগী (৩য় খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩৩৯ (২৭ অক্টোবর ১৯৩২)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১২২।

৭. বড়বাড়ী। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩২৩ (২ অক্টোবর ১৯১৬)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৭৯। আট আনা সিরিজের নবম গ্রন্থ। অষ্টম সংস্করণের তথ্য পাওয়া যায় 'জলধর গ্রন্থাবলী'র (২য় খণ্ড) পরিশিষ্টের বিজ্ঞাপনে; এই গ্রন্থটি জলধর ১৮৭৫ সালে ১৫ বছর বয়সে 'মিত্র পরিবার' নামে রচনা করেন।

৮. হরিশ ভাণ্ডারী। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: বৈশাখ ১৩২৬ (১৫ মে ১৯১৯)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৪৫। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: আট আনা। চতুর্থ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

৯. ঈশানী। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১৯। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৯৭। তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: এক টাকা আট আনা।

"যে সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসাপ্রার্থী হইয়া জলধরবাবু এই এতকাল লেখনী-চালনা করিতেছেন, যে অত্যাচারগ্রস্থা রমণীদিগের—আমাদেরই গৃহের দেবীদিগের—শোচনীয় পরিণাম তাহার হৃদয়কে এই সুদীর্ঘকাল ব্যথিত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে—'ঈশানী' তাহারই একটা হৃদয়-ভেদী কাহিনী—হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া লিখিত।" ('জলধর গ্রন্থাবলী'—২য় খণ্ড; পরিশিষ্ট)।

১০ পাগল। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১ বৈশাখ ১৩২৭ (মে ১৯২০)। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪২।

১১. চোখের জল। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩২৭ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। মূল্য: একটাকা আট আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৮০।

১২. ষোল-আনি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলি-কাতা। প্রকাশকাল: বসন্ত-পঞ্চমী ১৩২৭ (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২১)। মূল্য: একটাকা আট আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫৭।

১৩. সোনার বালা। প্রকাশকাল: ২৫ পৌষ ১৩২৮ (ফেব্রুয়ারী ১৯২২)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৮৪।

১৪. দানপত্র। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩২৯ (২ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। মূল্য: একটাকা চার আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৪+১২৩। উৎসর্গ: স্নেহাস্পদ/শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায়/ও শ্রীমান সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়/করকমলেষু।

১৫. পরশ-পাথর। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: কার্তিক ১৩৩১ (নভেম্বর ১৯২৪)। মূল্য: একটাকা আট আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫৬।

১৬. ভবিতব্য। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩৩২ (আগষ্ট ১৯২৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫৪।

১৭. তিন পুরুষ। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩৩৪ (?)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৪৪। জলধর সেনের এই উপন্যাসের সঙ্গে নামের সাদৃশ্য থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেন 'যোগাযোগ'।

১৮. উৎস। প্রকাশক: কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: আষাঢ় ১৩৩৯ (২০ জুলাই ১৯৩২)। মূল্য: একটাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৪+ ১০৭। প্রচ্ছদ: যতীন্দ্রকুমার সেন।

'উৎস'ই জলধরের শেষ উপন্যাস। নিজে অর্থব্যয় করে এই বইটি ছাপেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পরামর্শে লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাওয়ের নামে 'উৎস' উৎসর্গ করে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য-সংগ্রহের চেষ্টা করে বিফল হন। (দ্র. সাগরময় ঘোষ: 'সম্পাদকের বৈঠকে'; প: ৮-১৩)।

ভ্রমণ-কাহিনী

১. প্রবাস-চিত্র। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৫ বৈশাখ ১৩০৬ (এপ্রিল ১৮৯৯)। মূল্য: একটাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৮+২০৮।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত নতুন সংস্করণের ১০ম মুদ্রণ: ১৩৪৪। মূল্য: একটাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৮২+২। প্রথম

সংস্করণের সূচী: প্রবাস-যাত্রা, গুরুদ্বার, নালাপাণি, কলুঙ্গার যুদ্ধ, টপকেশ্বর, গুচ্ছপাণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহস্রধারা, মুশৌরী, তিহরী, অতিপ্রকৃত কথা, উত্তর-কাশী।

২. হিমালয়। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩০৭ (১৩ অক্টোবর ১৯০০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ॥.-|-৩৩৯। উৎসর্গ: ভাওয়াল-অধিপতি, সুধিগণাগ্রগণ্য/শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী/বাহাদুর করকমলেষু—।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী. কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩১২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ॥/.+২৮৪। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণের মূল্য একটাকা চারআনা ও অষ্টম সংস্করণের মূল্য একটাকা আটআনা;

'হিমালয়' সম্পর্কে 'ভারতী' পত্রিকার (বৈশাখ: ১৩০৮) মন্তব্য: "স্বদেশে গেরুয়াবসনে, একখানা কম্বল ও কিছু তাম্রমুদ্রার সহায়ে স্বল্পায়োজন ভ্রমণও যে বিপদসঙ্কুলতায় ও চিত্তহারিতায় যুবা-জনলোভন হইতে পারে, নব্যবঙ্গে 'হিমালয়' লেখক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকক্রমে এ সত্য ঘোষণা করেন। সেই কাহিনীগুলি তিনি এক্ষণে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আর সকল বঙ্গীয় লেখকের অগ্রবর্ত্তিতায় লেখক অভিনন্দনযোগ্য, এবং বঙ্গভাষায় এরূপ ভ্রমণবৃত্তান্তের অভ্যুদয় বাঙ্গালীমাত্রেরই আত্মাভিনন্দনের কারণ জ্ঞান করি।"

'হিমালয়' সম্পর্কে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "কথ্যভাষায় লেখা বই এই বোধহয় প্রথম। আমাদের কথ্যভাষাও যে সাহিত্যের ভাষা হ'তে পারে তার পরিচয় পেলাম এই বই পড়ে।" ('জলধর-কথা' ঃ "শ্রদ্ধাঞ্জলি"; পৃ: ৩২)। 'হিমালয়ে'র অতুলনীয় সাক্ষ্য: "পল্লীর প্রত্যেক পাঠাগারে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র ন্যায় 'হিমালয়'ও পাওয়া যেত।" ('জলধর-কথা'। "প্রবাসী বন্ধুর শ্রদ্ধা-নিবেদন"; পৃ: ১৩)।

৩. পথিক। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩০৮ (৬ অক্টোবর ১৯০১)। পৃ:-সংখ্যা: ১৬১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের মূল্য: একটাকা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন: "ইহাকে 'প্রবাস-চিত্র' ও 'হিমালয়ে'র

পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।' ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা': "জলধর সেন"; পৃঃ ৫৪)।

৪. হিমাচল-বক্ষে। প্রকাশক: বসুমতী কার্যালয়, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩১১ (২ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৬০। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পত্রিকার গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এই বই প্রকাশ করেন।

৫. হিমাদ্রি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩১৮ (২৩ নভেম্বর ১৯১১)। মূল্য: বারো আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫৯। জলধরবাবুর 'হিমালয়' চলতি কথায় অর্থাৎ কথ্যভাষায় লিখিত; হিমাদ্রি সাধুভাষায় তাঁহারই সার সংগ্রহ। এখানি হিমালয়েরই ন্যায় বিদ্যালয়সমূহে আদৃত হইয়াছে, অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ('জলধর গ্রন্থাবলী'-২য় খণ্ড; পরিশিষ্ট)।

৬. আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ। প্রকাশকাল: ফাল্গুন ১৩২১ (১৮ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৮২। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহ্‌তাবের ভ্রমণ-কথা 'Impressions' গ্রন্থের ভাষান্তর।

৭. দশদিন। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ভাদ্র ১৩২৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬)। মূল্য: একটাকা চার আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫২। "জলধরবাবু একবার দশদিনের জন্য পশ্চিম-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেবার তিনি আগ্‌রা ও কাশী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'দশদিনের' পরিচয় এই যে, ইহা জলধরবাবুর ভ্রমণবৃত্তান্ত—এই পরিচয়ই যথেষ্ট।" ('জলধর গ্রন্থাবলী'—২য় খণ্ড; পরিশিষ্ট)।

৮. মুসাফির-মঞ্জিল। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: মাঘ ১৩৩০ (২৪ জানুয়ারী ১৯২৪)। মূল: আট-আনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৩৬। আট আনা সিরিজের গ্রন্থ।

৯. দক্ষিণপথ। প্রকাশকাল: অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (১০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ২৫৫।

১০. মধ্যভারত। সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: মাঘ ১৩৩৬ (১৯ জানুয়ারী ১৯৩০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ২০৪।

জলধর

আত্মীয়ের প্রীতি মাঝে যে দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে, দিগন্তের অস্তাচল হোতে
প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরী
১৩।৫।৩৯

জলধর-সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

যিনি বাংলা সাহিত্য সমাজে আপন স্নিগ্ধ সহৃদয়তাগুণে বর্তমান সাহিত্যসাধকদের হৃদয় জয় করিয়াছেন সেই প্রবীণ সাহিত্যতীর্থপথিক শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্মাননার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট প্রশস্তিপুস্তকে এই কয়েকছত্র অর্ঘ্যরূপে পাঠাইলাম। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জলধর সেনের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের প্রণামার্ঘ্য

১১. হিমালয়ের স্মৃতি। 'বসুমতী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত। ('জলধর-কথা', পৃঃ ১৮২)।

প্রবন্ধ/নক্শা

১. সেকালের কথা। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩৩৭ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১১। রচনাসূচী: যমজয়ী চূড়ামণি দত্ত, সেকালের ভোজ, কেরোসিন তেল, আমার প্রথম চা-পান, সেকালের বাল্য-বিবাহ, লর্ড মেয়োর অপঘাত মত্যু, বিজয়া-উৎসব, ভাতার-মারীর মাঠ, বালিকা-বিদ্যালয়, সেকালের পাঠশালা, সেকালের ছাত্রশাসন, পাঠশালার ছাত্র ও তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী।

জীবনী

১. কাঙ্গাল হরিনাথ (১ম খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৫ আশ্বিন ১৩২০। (২০ অক্টোবর ১৯১৩)। মূল্য: একটাকা চারআনা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫৯। উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মহ্তাব বাহাদুর/শ্রীকরকমলেষু।

'কয়েকটি কথা' শীর্ষক লেখকের ভূমিকায় বলা হয়েছে: " 'কাঙ্গাল হরিনাথ' মানসীপত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই অংশ-মাত্র লইয়া এই প্রথম খণ্ড রচিত হইল। মানসীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক নূতন কথা এবং অপূর্ব্ব-প্রকাশিত গীত এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।"

খ. কাঙ্গাল হরিনাথ (২য় খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: জন্মাষ্টমী ১৩২১ (৩১ আগষ্ট ১৯১৪)। মূল্য: একটাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৫২। উৎসর্গ: সোদরোপম/শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়/করকমলেষু। বর্দ্ধমানের মহারাজার অর্থানুকূল্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

লেখক 'নিবেদনে' বলেছেন: "কাঙ্গাল হরিনাথে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। 'মানসী' পত্রিকায় কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত

হইয়াছিল, তাহার সহিত আরও কয়েকটি তত্ত্ব সংযোজিত হইয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

আত্মজীবনী

১. জলধর সেনের আত্মজীবনী। লিপিকার: নরেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক: প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: বৈশাখ ১৩৬৩ (এপ্রিল ১৯৫৬)। মূল্য: তিন টাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৬+১৫৪।

এই আত্মজীবনীতে জলধরের 'শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সব কথাই' বিবৃত হয়েছে। লিপিকারকে বলেছিলেন, "আমার প্রথম জীবনের কথাই তোমাদের বলে গেলাম। পরবর্তী জীবনের কথা অনেক বন্ধুবান্ধবই ভাল করে জানেন, তাঁদের কাছ থেকে সে সব সংগ্রহ করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হবে না।" ('জলধর সেনের আত্মজীবনী', লিপিকারের ভূমিকা; পৃঃ ৪)।

শিশুতোষ রচনা

১. সীতা দেবী। সচিত্র জীবনী। প্রকাশক: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩১৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৭৬। লেখক 'নিবেদনে' বলেছেন: "পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যধিক আগ্রহে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া দিই। সময়ের অল্পতায় এবং লেখকের অযোগ্যতায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। তবে সতীমহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি —ইহাই আমার পরম লাভ।"

পঞ্চম সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩২৯। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য: একটাকা। নবম সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়।

২. কিশোর। প্রকাশক: স্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩২১ (জানুয়ারী ১৯১৫)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য: একটাকা চারআনা। পৃষ্ঠ-সংখ্যা: ।৵০+১৪২।

'জলধর গ্রন্থাবলী'র (২য় খণ্ড) পরিশিষ্টে এই বইয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "কিশোরদের জন্য লিখিত উপদেশপূর্ণ গল্প-সংগ্রহ। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, কিশোরদিগের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে জলধর-বাবুর কিশোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

৩. শিব-সীমন্তিনী। F. W. Bain-এর 'In the great god's Hair' পুস্তকের গল্প অবলম্বনে রচিত। প্রকাশক: ভট্টাচার্য এণ্ড সন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৵০+৯০।

৪. মায়ের পূজা। গল্প। প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ (মে ১৯২৭) পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১৪৬।

৫. আফ্রিকায় সিংহ শিকার। প্রকাশকাল: ১৯২৯। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১৬।

৬. রামচন্দ্র। প্রকাশকাল: ১ আশ্বিন ১৩৩৭ (সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৫৪।

৭. আইসক্রীম সন্দেশ। প্রকাশকাল: ১৯৩৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ১১১।

৮. সাথী। মূল্য: চার আনা।

৯. সন্দেশ।

১০. ফটিক।

১১. ভারতী।

বিদ্যালয়-পাঠ্য।

১. বঙ্গ-গৌরব (১ম খণ্ড)। সচিত্র। প্রকাশক: ম্যাকমিলান এণ্ড কোং, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৯২৯ (?)।

খ. বঙ্গ-গৌরব। (২য় খণ্ড)। সচিত্র। প্রকাশক: ম্যাকমিলান এণ্ড কোং, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৯৩৭ (?)।

২. বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ।

৩. প্রথম শিক্ষা।

৪. শিশুবোধ। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

৫. নবীন ইতিহাস। ১ম ও ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল: ১৯৩৩।

৬. অমিয় পাঠ।

৭. সোপান। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের কাছে লিখিত জলধর সেনের এক পত্রে (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০) এই বইটির নাম পাওয়া যায়।

গ্রন্থাবলী

১. ক. জলধর গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: শ্রাবণ ১৩৩০ (জুলাই ১৯২৩)। মূল্য: দুইটাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৬২৪। অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ: হিমাদ্রি, চোখের জল, প্রবাস-চিত্র, পাগল, পুরাতন পঞ্জিকা, করিম সেখ, আশীর্ব্বাদ।

প্রথম খণ্ড সম্পর্কে 'ভারতী' পত্রিকার (চৈত্র ১৩৩০; পৃ: ১১৭১) মন্তব্য: "জলধরবাবু বাংলাসাহিত্যের একজন পাকা ওস্তাদ লিখিয়ে; তাঁর রচনা বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সাগ্রহে পাঠ করেন; এবং তাঁর জনপ্রিয়তারও নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। এই জনপ্রিয় প্রবীণ লেখকের গ্রন্থরাশি সুলভে প্রকাশের চেষ্টা সকলেই সানন্দে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন, সন্দেহ নাই।"

খ. জলধর গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড)। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ (১৪ মে ১৯২৫)। মূল্য: দুই টাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৫৮০। অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ: কাঙ্গাল হরিনাথ-১ম ও ২য় খণ্ড, এক পেয়ালা চা, দশদিন, দু:খিনী, ষোল-আনি, নৈবেদ্য।

প্রকাশক তাঁর 'নিবেদনে' বলেছেন: "আমরা যখন জলধর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি, তখন বলিয়াছিলাম যে, যদি পাঠক-সাধারণ এই প্রথম খণ্ড সাদরে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা করিব। আনন্দের কথা, জলধর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করিয়াছে; তাই আমরা এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিলাম। আশা আছে, এখানিও প্রথম খণ্ডের ন্যায় পরম সমাদরে গৃহীত হইবে।"

গ. জলধর গ্রন্থাবলী (৩য়খণ্ড)। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায় 'জলধর-কথা' (পৃ: ১৮২) ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার (বৈশাখ ১৩৪৬; পৃ: ৮২০) সূত্রে।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. হরিনাথ গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ)। প্রকাশক: জলধর সেন, [বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির], কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩০৮ (৪ নভেম্বর ১৯০১)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৩৩২।

'ভূমিকা'য় জলধর সেন লিখেছেন: "বসুমতীর সুযোগ্য-স্বত্বাধিকারী উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণগত যত্ন ও সাহায্যে স্বর্গীয় কাঙ্গাল হরিনাথের বিস্তৃত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। . . . . সুধী পাঠকবৃন্দের . . . উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের বাসনা রহিল।"

২. জাতীয় উচ্ছ্বাস। স্বদেশী সঙ্গীত সংগ্রহ। প্রকাশক: পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, [বসুমতী সাহিত্য-মন্দির], কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৯০৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা: ৭৫ + ।/০। সংকলিত গানের সংখ্যা: ১০০।

৩. ক. প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ)। [সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কাব্য-সংগ্রহ। প্রকাশকাল: ১৩২২।

খ. প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী (২য় ভাগ)। প্রকাশকাল: ১৩২২।

গ. প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী (৩য় ভাগ)। প্রকাশকাল: ১৩২৩।

সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র পরিচালনা

সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র পরিচালনার সূত্রে জলধর সেন বঙ্গদেশের বেশ কয়েকটি উচ্চমানের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বাঙলা সাময়িকপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জলধর সেন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বলা চলে 'প্রতিষ্ঠানে' পরিণত হয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথম চার দশক জুড়ে তাঁর এই প্রচেষ্টা বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

জলধরের সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁর সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র-পরিচালনার হাতেখড়ি। হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা' পরিচালনার একপর্যায়ে যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন, তখন কুমারখালী বাঙলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্ন-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাঙাল-শিষ্য জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রমুখের উদ্যোগে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে 'গ্রামবার্ত্তা' (সাপ্তাহিক) পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং ১২৯২ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত চালু থাকে।[১০১]

> 'গ্রামবার্ত্তা'র জীবনের শেষ দুই বৎসর আমি নানাভাবে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং তার অন্তিম সৎকার আমার ও আর দু'চার-জন বন্ধুর হাতে হয়। সুতরাং, 'গ্রামবার্ত্তা'র কথা বলতে গেলে আমার জীবনের একটা প্রধান কথা।[১০২]

'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদনার প্রসঙ্গে জলধর উল্লেখ করেছেন:

> আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। 'গ্রামবার্ত্তা'র যা কিছু কাজ, পূজনীয় প্রসন্ন পণ্ডিত মশাই করতেন। আমি প্রতি শনিবার রাত্রে গোয়ালন্দ মেলে কুমারখালিতে আসতাম, পরদিন রবিবারে পণ্ডিত মহাশয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। পণ্ডিত মহাশয় সম্পাদক পদ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হননি। তাই শেষের দু'বছর আমার নামই সম্পাদক হিসাবে ছিল। কাজ যা কিছু পণ্ডিত মহাশয়ই করতেন— এবং গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন বাড়ীতে থাকিতেন তখন তাঁর মূল্যবান সাহায্য পণ্ডিত মহাশয় পেতেন।[১০৩]

'গ্রামবার্ত্তা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলধরের সাংবাদিকতা ও সাময়িক-পত্র-সম্পাদনার প্রথম শিক্ষানবিশী-পর্বেরও সমাপ্তি ঘটে।

জলধরের 'গ্রামবার্ত্তা' পরিচালনাকালের দু'টি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হলো জলধরের নেতৃত্বে বড়লাট রিপনের ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের কালে পোড়াদহ রেলস্টেশনে রিপন-প্রশস্তি-সঙ্গীত পরিবেশন এবং লাট প্রতিনিধির নিকট থেকে তার সানন্দ স্বীকৃতি। দ্বিতীয় ঘটনা, 'গ্রামবার্ত্তা' পরিচালনার অবসরে পত্রিকা কার্যালয় থেকেই খেয়ালের বশে বাউলগান

রচনা করে 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল' গঠন উত্তরকালে যা সমগ্র বঙ্গদেশ মাতিয়ে তুলেছিল।

'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদনা-ত্যাগের দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর জলধর পুনরায় সংবাদপত্র-জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। মহিষাদল রাজস্কুলের শিক্ষকতা কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর কলকাতায় আগমন ও সাময়িক-পত্রের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিষয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০–১৯২১) ভূমিকাই ছিলো প্রত্যক্ষ ও প্রধান। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬—১৯৬২) জলধর সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় বলেছেন :

> ···তিনি যখন নিরুপদ্রব শিক্ষকতা লইয়া সুদূর মফঃস্বলে ছিলেন, তখন যে তিনজন তাঁহাকে সাহিত্যের---বিশেষ সংবাদপত্রের ঝটিকা-তাড়িত ক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি আর যে দুইজনের কথা বলিতেন তাঁহারা---সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। জলধরবাবুকে—তিনি জীবনের অর্দ্ধাংশেরও অধিককাল যে ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং যে ক্ষেত্রে তিনি ধন ও মান, পরিচয় ও বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে আনিবার প্রধান কারণ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।[১০৪]

এই সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টাতেই তিনি ১৮৯৯ সালে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। কিন্তু চিন্তাদর্শগত পার্থক্যের কারণে তিনি "দেড়মাস 'বঙ্গবাসী'র সেবা করিবার ভান করে অবশেষে অব্যাহতি লাভ" করেন।[১০৫] 'বঙ্গবাসী' ছিলো কট্টর সনাতনী হিন্দুসমাজের কাগজ। 'বঙ্গবাসী'র অনুদার ধর্মীয় মতামত ও রক্ষণশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন করা জলধরের পক্ষে সম্ভব হয় নি। হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ বলেছেন, জলধর কলকাতায় এসে প্রথমে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' পত্রিকায় যোগ দেন, পরে 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে যুক্ত হন।[১০৬]

'বঙ্গবাসী'র স্বল্পকালের চাকুরীর পর তিনি ১৮৯৯ সালের ২৭ এপ্রিল (১৫ বৈশাখ ১৩০৬) সাপ্তাহিক 'বসুমতী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। অনেকটাই আকস্মিকভাবে মাত্র ছয়-সাতমাস পরে তিনি সম্পাদকের দায়িত্বলাভ করেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় এ-প্রসঙ্গে বলেন :

পূজা কেটে গেল [১৩০৬)। আমরা অবকাশান্তে এসে কার্য্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিতভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হোলো, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হোলো।...এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়িবাবু 'বসুমতী' থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থলে আমি সম্পাদক নিযুক্ত হলাম।...অতবড় একখানা কাগজ আমি একলা কি করে চালাই। আমার তখন মনে হোলো সুহৃদবর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রী অরবিন্দকে বাংলাভাষা শিখাচ্ছিলেন।···আমি তখন উপেন্দ্রবাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হতে সম্মত হলেন এবং দশ-পনের দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে তিনিও হাঁপ ছাড়লেন---আমিও হাঁপ ছাড়লাম।[১০৭]

বাংলা ১৩১৩ সালে জলধরের পারিবারিক জীবনে এক মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে। কালান্তক কলেরা রোগে তিনি তাঁর একমাত্র সহোদর শশধর ও কন্যা অচলাকে হারান। একমাত্র সহোদরা সুসারসুন্দরীর মৃত্যু হয় বসন্তরোগে। শোকাহত ভগ্নহৃদয়ে তিনি তাঁর পত্নীকে নিয়ে গ্রামের বাড়ী কুমারখালীতে যান। জলধর প্রায় আট বছর 'বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দীনেন্দ্রকুমার রায় 'বসুমতী'র সম্পাদক হন।[১০৮]

১৩১৩ সালে পারিবারিক বিপর্যয়ের পর জলধর কয়েকমাস কুমারখালীতে কাটিয়ে কলকাতায় যখন ফিরে আসেন ততদিনে দীনেন্দ্রকুমার 'বসুমতী'র সম্পাদকের দায়িত্বলাভ করেছেন। এইসময় কর্মহীন জলধরকে বিশেষ অর্থকষ্টে পড়তে হয়। তাঁর অখণ্ড অবসরের কিছুটা মাঝে-মধ্যে অতিবাহিত করতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১---১৯০৭) সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'র অফিসে। খুবই স্বল্প সময়ের জন্য জলধর কিভাবে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে:

সেইসময়ে একদিন উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন—দেখুন জলধরবাবু, আপনার ত এখন কোন কাজ নেই। প্রত্যহ সকালবেলা 'সন্ধ্যা' অফিসে আসুন না কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন—আর 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্য এক কলম কি দু'কলম যা হয় লিখবেন।

বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব না। 'সন্ধ্যা'র সে শক্তি নেই। নগদ দুটি ক'রে টাকা দেব। আমি ভাবলাম--মন্দ কি? বসেই তো আছি, যে দিন আসবো চা যোগ তো হবেই, আর 'সন্ধ্যা' কাগজের এক কলম কি দু'কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণা নগদ দুটি টাকা---যথা লাভ।[১০৯]

কিন্তু এই ব্যবস্থা খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। জানা যায়, 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় জলধরের কাজের মেয়াদ মাত্র কয়েকদিনের।

এরপর জলধর সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা পরিচালনার আমন্ত্রণ লাভ করেন। 'হিতবাদী' ছিলো সেকালের খ্যাতিমান সংবাদপত্র। ১৮৯১ সালের ৩০ মে 'হিতবাদী' প্রকাশিত হলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০---১৯৩২) এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'হিতবাদী'র প্রথম পর্যায়ে সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথও (১৮৬১—১৯৪১) যুক্ত ছিলেন। এরপর এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় (২১ মে ১৮৯৪) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের (১৮৬১—১৯০৭) উপর। ১৯০৭ সালের ৪ জুলাই কাব্যবিশারদের মৃত্যু হলে জলধর 'হিতবাদী' পরিচালনার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি সম্পাদক হিসেবে সখারাম গণেশ দেউস্করের (১৮৬৯—১৯১২) নাম প্রস্তাব করেন এবং তাঁর সহকারী হিসেবে 'হিত-বাদী'তে যোগ দিতে সম্মত হন। 'দরিদ্র বন্ধু' দেউস্করের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্যই তাঁর এই আন্তরিক স্বার্থত্যাগ। জলধরের এই মহানু-ভবতা ও বন্ধুকৃত্য অতুলনীয়।

রাজনৈতিক কারণে কয়েকমাসের মধ্যেই সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারীদের মতবিরোধ হয় এবং তিনি পত্রিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে জলধর 'হিতবাদী'র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু জলধরও খুব বেশিদিন এই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেন নি। স্মৃতিচারণায় বলেছেন তিনি:

... হিতবাদীর পরম শুভানুধ্যায়ীরা বলতে আরম্ভ করলেন, হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চুপ করে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হতে লাগলো, আমি বিশারদের বৈশিষ্ট্য

ক্ষুণ্ন করছি। যে বিশারদ-দাদাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে, এ অভিযোগ আমি সহ্য করতে পারলাম না—আমি তখন বিশারদদাদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তাঁহার হিতবাদীর সেবা হতে অবসরগ্রহণ করলাম।[১১০]

এর দু-বছর পর জলধর 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন:

জলধর হিতবাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া (ইং ১৯০৯) সন্তোষের জমিদার শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ছেলে-মেয়ের অভিভাবক ও শিক্ষক-রূপে দুই বৎসরাধিককাল সন্তোষে ছিলেন; কিছুদিন দেওয়ানীও করিয়াছিলেন। সন্তোষে অবস্থানকালে 'সুলভ সমাচারে'র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য জলধর অনুরুদ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদকত্বে নবপর্যায়ের দৈনিক 'সুলভ সমাচার' ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ (১৯১১, ১৪ এপ্রিল) ক্রীক রো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল...। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না, জলধরই তাঁহার নির্দেশমত পত্রিকার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস যাইতে না যাইতেই নরেন্দ্র-নাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে জলধরই বর্দ্ধিত বেতনে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এক বৎসরের অধিককাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া গেল। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহারা 'সুলভ সমাচারে'র জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন না।[১১১]

জলধর সেনের সাময়িকপত্র-পরিচালনা জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সফল অধ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা সম্পদনা করা। 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে তাঁর আকাস্মিকভাবে জড়িত হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্ক স্মৃতিচারণায় তিনি বিশদ উল্লেখ করেছেন। 'সুলভ সমাচার' বিলুপ্ত হওয়ার পর জলধর সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর প্যারাগন প্রেসের ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ

করেন। এইসময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে যুগ্ম-সম্পাদক করে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই প্যারাগন প্রেস থেকে পত্রিকা ছাপার ব্যবস্থা করেন। স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রণ-তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ম্যানেজার হিসেবে জলধর সেনের ওপরে বর্তায়। এরপর, জলধরের ভাষায়:

> আমি চারপাঁচ ফর্ম্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম। প্রথম ফর্ম্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, সেই-দিনই সেই ফর্ম্মার প্রুফ্ দেখতে দেখতে অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।
>
> তখন চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। 'ভারতবর্ষে'র কর্মকর্ত্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হ'ল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যপদে জোর করে বসিয়ে দিলেন।[১১২]

প্রথমে জলধর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে যুক্তভাবে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতে বিদ্যাভূষণের পরিবর্তে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক হন। তৃতীয় বর্ষে উপেন্দ্রকৃষ্ণ চলে গেলে জলধর এককভাবে পত্রিকা সম্পদনার দায়িত্ব-লাভ করেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মন্তব্য করেছেন, "সম্পাদক নির্ব্বাচন যে তখন পরীক্ষামূলকভাবেই হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সেই পরীক্ষায় জলধর উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন।[১১৩] আষাঢ়--১৩২০ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর চেষ্টা ও যত্নে 'ভারতবর্ষ' বঙ্গদেশের একটি নেতৃস্থানীয় মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তাঁর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। 'ভারতবর্ষ', জলধর-জীবদ্দশায়, প্রায় তিন দশক বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম বাহন ছিলো, আর জলধর ছিলেন সেই কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। এই পত্রিকা জলধরের অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। যথার্থই "'ভারতবর্ষ' তাঁহার প্রিয় ও আশ্রয় ছিল।"[১১৪]

সাময়িকপত্র-পরিচালনায় তাঁর সাফল্যের বিষয়ে তাঁর এক গুণগ্রাহী মন্তব্য করেছেন, " 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'সুলভ সমাচার'

প্রভৃতি বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী পত্রিকাগুলির সম্পাদকরূপে বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভতি পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন ও 'জনমত' গঠনে সাহায্য করিতেন" এবং তাঁর সম্পাদিত "পত্রিকাদির সাহায্যে ও অবলম্বনে বাংলাদেশ . . . দ্রুত সকলের ও সকল প্রদেশের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল"।[১১৫]

সাময়িকপত্রসেবী জলধর সেনের সাফল্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:

> যিনি বহুকাল ধরে, 'ভারতবর্ষ'-এর ন্যায় প্রকাণ্ড মাসিকপত্রের ভার বহন করেছেন এবং তার উন্নতি সাধন করেছেন—তাঁর এ কতিত্বের জন্য আমি তাঁকে বাহবা দিতে বাধ্য, কারণ এরজন্য যে কি পরিমাণ অধ্যবসায় প্রয়োজন তা আমি অনুমান করতে পারি। আমিও একসমনে একখানি স্বল্পকায় মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করি, কিন্তু বেশিদিন সেটিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারিনি যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে পত্রের সহায় ছিলেন।[১১৬]

কাঙাল হরিনাথ ও জলধর সেন

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার উনিশ শতকের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। দূর-মফস্বলের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করে সেই পল্লীকেই তাঁর কর্ম ও সাধনার কেন্দ্রভূমি হিসেবে গ্রহণ করে তিনি যে অসামান্য সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জন করেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। সাময়িকপত্র-পরিচালনা, সাহিত্যচর্চা, শিক্ষকতা ও ধর্মসাধনার ভেতর দিয়ে তিনি একটি সৃষ্টিমুখর যুগের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে কুমারখালীতে সাহিত্যচর্চার একটি অনুকূল আবহ গড়ে উঠেছিল। হরিনাথ কেবল সাহিত্য-স্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিকেরও স্রষ্টা ছিলেন এবং অনেককেই 'সাহিত্য-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত' করে বাঙলা-সাহিত্যে খ্যাতিমান হওয়ার সুযোগ করে দেন। এই 'কাঙাল-মণ্ডলী'র সদস্য ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, জলধর সেন, অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। মেহেরপুরের দীনেন্দ্রকুমার রায় ও কৃষ্ণনগরের চন্দ্রশেখর করও যুক্ত হয়েছিলেন 'কাঙাল-মণ্ডলী'তে। কাঙালের এই মধুচক্রে বাউল-শিরোমণি লালন ফকিরেরও (১৭৭৪—১৮৯০) আন্তরিক

যোগ ছিলো। উত্তরকালে এঁরা সকলেই দেশখ্যাত সাহিত্যিকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। কাঙাল হরিনাথের এই প্রেরণা-পৃষ্ঠপোষকতা অনেকাংশে কবি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়।

জলধর সেনের জীবনে কাঙাল হরিনাথের প্রেরণা ও প্রভাব সর্বাধিক। জন্ম-মুহূর্ত থেকেই জলধর হরিনাথের কাছে ঋণী। হরিনাথকে জলধর তাঁর 'শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, জীবন-পথের একমাত্র পথপ্রদর্শক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর নিজের কথায়, "আমার ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনের কথা, কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন-কথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"[১১৭] জলধরের জন্মের দিন সেনবাড়ীতে প্রধানত হরিনাথের উৎসাহেই কাঙালী-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। জন্মলগ্ন থেকেই জলধর হরিনাথের স্নেহ ও মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। জলধর লিখেছেন :

> ···সাধক হরিনাথ বাড়ীর সকলকে ব'লে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলে যেদিন আঁতুড় থেকে বেরুবে, সেদিন কেউ একে আগে কোলে করতে পারবে না, আমি কোলে করব। তাঁর সে আদেশ কেউ অমান্য করেনি, আঁতুড় থেকে বেরিয়েই প্রথম আমি তাঁরই কোলে স্থান পেয়েছিলুম।[১১৮]

নবজাতকের নামকরণও করেছিলেন কাঙাল হরিনাথ: "হলধরকাকার ছেলের নাম আর কি হবে, জলধর হবে।" কোষ্ঠীপত্রে হরিনাথ স্বহস্তে এই নামটি লিখে দিয়েছিলেন।[১১৯]

জলধরের বিদ্যাচর্চার হাতেখড়িও হয়েছিল হরিনাথের কাছে। তিনি যে-সময় কুমারখালী বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তখন সেখানে প্রধান শিক্ষক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। জলধর গণিতে খুব কাঁচা থাকলেও "কাঙ্গাল হরিনাথের আশীর্ব্বাদের আর শিক্ষার গুণে" বাঙলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও অধিকার জন্মেছিল। গণিতে অকৃতকার্য হয়েও কেবল হরিনাথের সুপারিশের জোরে ফি-বছর জলধর ক্লাসে প্রমোশন পেতেন। হরিনাথের এই প্রশ্রয় ও প্রেরণা বাল্যকাল থেকেই জলধরের মনে সাহিত্যবোধ সঞ্চারে সহায়তা করেছিল।

তাঁর ছাত্রজীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গেও কাঙাল হরিনাথের ভূমিকা যুক্ত ছিলো। একবার স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কুমারখালীতে স্কুল-পরিদর্শনে আসেন। কাঙাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে জলধর 'হাতযোড় করে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মিত্রবিলাপ কাব্য' থেকে আবৃত্তি করেন এবং এই আবৃত্তি শুনে 'ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ' হয়েছিল। মুগ্ধ ভূদেববাবু বালক জলধরকে এরজন্য বই উপহার দিয়ে পুরস্কৃতও করেছিলেন।

উত্তরকালে হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে জলধর কাঙালকে দুই বছরের জন্য কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিলেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই জলধরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। তাঁর ভাষায়:

> আমি আমার সাহিত্যসেবার প্রেরণা পেয়েছিলাম কাঙাল হরিনাথের কাছে। আর সুযোগ পেয়েছিলাম—'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র মধ্য দিয়ে।[১২০]

'গ্রামবার্ত্তা'-সম্পাদনাকালে ক্ষণিকের খেয়াল হতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন ও 'ছাপাখানার ভূতের দলে'র উদ্যোগে গঠিত হয় 'ফিকিরচাঁদ ফকিরে'র বাউলগানের দল। এই অভিনব প্রয়াসের সঙ্গে হরিনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং কালক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশ এই ফিকিরচাঁদের গানে মাতোয়ারা হয়।

কাঙাল তাঁর ফিকিরচাঁদের দল নিয়ে নানা স্থান সফরকালে অনেকক্ষেত্রেই জলধর তাঁর সঙ্গী ছিলেন। জলধর যখন গোয়ালন্দে ছিলেন হরিনাথ তখন একবার তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই স্মৃতি জলধরের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে:

> আমার গোয়ালন্দে অবস্থান-কালে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা আমার প্রবাস-ভবনে কাঙাল হরিনাথের পদধূলি-দান।[১২১]

গোয়ালন্দ থেকে জলধর কাঙালের নেতৃত্বে ফিকিরচাঁদের দলের সঙ্গে ফরিদপুর কৃষি-প্রদর্শনীতে যান। এখানে অনুষ্ঠিত গানের আসরে জলধরও অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি রাজশাহীতে ফিকিরচাঁদের দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এক বড়দিনের ছুটিতে। কাঙালের নির্দেশে তাঁকে গান গাইতে হয়েছে, জনসমক্ষে বক্তৃতা করতে হয়েছে। এরপর ১২৯১ সালের মাঘ মাসে জলধর কলকাতায় কাঙালের সফরসঙ্গী হন। এ-ছাড়া আরো বহুস্থানে

তিনি কাঙালের সঙ্গে গিয়েছেন। হরিনাথের কাছের মানুষ হিসেবে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী তিনি। এ-সবের অন্তরঙ্গ বিবরণ আছে তাঁর রচিত 'কাঙাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে।

কাঙাল হরিনাথের সঙ্গীত ছিলো জলধরের জীবনবেদ। নিজের বা অপরের দুঃখ-শোক-বেদনা-আনন্দ-বিস্ময়ে এই গান হয়েছে পরম অবলম্বন। জলধর সুকণ্ঠ গায়ক না হলেও তঁর নিবেদনে এমন একটি আন্তরিকতা ছিলো যা শ্রোতাকে সহজেই মুগ্ধ করতে পারতো। মহিষাদলে যখন শিক্ষকতা করেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একবার সেখানে যান। এক ঘরোয়া সঙ্গীত-বাসরে তাঁর হাসির গানের পর জলধরও হরিনাথ ও দাশরথী রায়ের (১৮০৬—১৮৫৭) কয়েকটি গান পরিবেশন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের শ্রোতা-সাক্ষী দীনেন্দ্রকুমার এই পরিবেশনা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর 'প্রাণের সকল আগ্রহ ঢালিয়া এরূপ আন্তরিকতার সহিত' পরিবেশিত গান শুনে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের শ্রোতৃবৃন্দ 'বিপুল হাস্যোচ্ছ্বাসের পর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ' এবং 'অনেকেরই চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল।[১২১]

সাক্ষ্য দিচ্ছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্রও (১৮৮০—১৯৬১)। একবার তিনি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন কিছুকাল। মৃত্যুচেতনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এইসময় জলধর সেন প্রতিদিন ভোরবেলা তাঁর রোগ-শয্যার পাশে বসে তাঁকে কাঙাল হরিনাথের গান শোনাতেন। তাঁর দরদী কণ্ঠে এক অনির্বচনীয় সান্ত্বনা যেনো গানগুলির ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেতো। জানিয়েছেন তিনি :

> কাঙ্গাল হরিনাথের গানগুলি তাঁহার কণ্ঠে যে কত মিষ্ট, তাহা যাহারা না শুনিয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝাইব কিরূপে? দাদার গানে যে শান্তি পাইতাম, তাহা চোখের জলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। শয্যাপার্শ্বে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁরা সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিতেন।[১২৩]

সংসারত্যাগী জলধর যখন হিমালয়ের যাত্রী তখনো চিত্তের আশ্রয় ছিলো হরিনাথের গান। "তখন সূর্য্য আকাশে উঠিয়াছে, বালসূর্য্যের কোমল কিরণ সেই সমুন্নত শুভ্র পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পতিত হইয়া অতুল শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সেই তুষারধবল আর্দ্র পর্ব্বত-শৃঙ্গে হিল্লোলিত হওয়ায়, বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে যে কি এক

অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইতেছিল, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না"—হিমালয়ের এই রূপচিত্র প্রত্যক্ষ করে জলধরের সঙ্গী এক স্বামীজী তাঁকে "সাধক-প্রবর হরিনাথ মজুমদারের হিমালয়ের গান গাহিতে অনুরোধ" করেন। জলধর বলেছেন:

> "আমারও প্রাণে 'কাঙ্গালের' সেই অপূর্ব্ব গান জাগিতেছিল; আমি হৃদয় খুলিয়া গাহিতে লাগিলাম,---ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে,—কেবা রে আদর কো'রে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে; আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমায় হীরার টোপর পরায়েছে। যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক, চুণি মণি টোপর মাঝে; ওরে তোর মাথার উপর, এমন টোপর কোন কারিগর গড়ায়েছে। এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, দুটি নয়ন ঝুরিতেছে; তাইতে রে ঝরঝর, নিরন্তর, নির্ঝরের জল পড়িতেছে। কাঙ্গাল কয় ওরে আঁধা, ও নয় কাঁদা, প্রেমে গিরি গলিতেছে।[১২৪]

কাঙ্গাল হরিনাথের মৃত্যু হয় ১৩০৩ সালের ৫ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল ১৮৯৬)। কাঙাল-স্মরণে জলধর 'দাসী' পত্রিকায় (জুন ১৮৯৬) যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে শোকাপ্লুত অন্তরে উচচারণ করেছিলেন:

> হরিনাথের জীবনী প্রকাশের ভার কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার ন্যায় অযোগ্য লেখকের দ্বারা তাঁহার মহৎ চরিতের কাহিনী যথাযথরূপে বর্ণিত হইতে পারেনা। কিম্বা আমি চরিত্র সমালোচকের আসনও গ্রহণ করি নাই; তাঁহার সদ্গুণসমূহ স্মরণপূর্ব্বক আমার শোকাবেগ লাঘব করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম।...হরিনাথ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কিছুই পারি নাই। কিন্তু হায়। যদি তাঁহারই নির্দ্দেশমত দেশের জন্য---আর্ত্ত, পীড়িত বিপন্নের জন্য কিছুও খাটিতে পারিতাম। তাঁহারই দিকে চাহিয়া যদি বলিতে পারিতাম—
>
> 'তোমারই চরণ করিয়ে স্মরণ চলেছি তোমারই পথে,
> 'তোমারই ভাবেতে হই বিভোর ধরি এই মনোরথে।'[১২৫]

কাঙাল-শিষ্যদের মধ্যে জলধর সেনই নানাভাবে গুরুর ঋণ স্বীকার ও শোধের চেষ্টা করেছেন, নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধা। তিনি দুই

খণ্ডে হরিনাথ-জীবনী ('কাঙ্গাল হরিনাথ' : ১৩২০ ও ১৩২১) রচনা করেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ('দাসী' : জুন ১৮৯৬/'মানসী' : ১৩১৯-২১/'ভারতবর্ষ' : বৈশাখ ১৩৩৮) কাঙাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন, কাঙালের স্মৃতিরক্ষায় আন্তরিক প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে কাঙালের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 'বিজয় বসন্ত' ও 'বাউল সঙ্গীত' (ভাদ্র ১৩২৩) এবং 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' (১ম ভাগঃ ১৩৩৮)। কাঙালের অনাহার ও নিরাশ্রয় পরিবার-পরিজনের জন্য গভীরভাবে মমতা অনুভব করেছেন। তাই তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাউল সঙ্গীতে'র 'নিবেদনে' উল্লেখ করেছেন :

> কাঙ্গাল-সন্তানগণের নিরাশ্রয় পরিবারদিগের ভরণপোষণের কথঞ্চিৎ সাহায্য এই পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থে হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া আমি পুনরায় এই অমূল্য গীতাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম।

কাঙালচর্চায় জলধরের আগ্রহ ও অবদানের কথা বলতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায় উল্লেখ করেছেন :

> ...হরিনাথের ভক্ত শিষ্য ও মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক,...সুলেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাদের সকলেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে হরিনাথের গ্রন্থাবলী একত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া কাঙ্গালের বিস্মৃতপ্রায় নাম সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর তিনি বিবিধ মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন রচনায় ও স্বতন্ত্র পুস্তকে হরিনাথের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সাহায্যে একদিন হয়ত তিনি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে কাঙ্গালের সাহিত্য-সাধনার প্রভূত পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যে হরিনাথের স্থান কোথায় এ বিষয়ের আলোচনা সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি স্বয়ং জলধরবাবু।[১২৬]

কাঙালের মৃত্যুর পর জলধর ছিলেন এই পরিবারের একজন নির্ভরযোগ্য সুহৃদ্ ও অভিভাবক। দুঃখে-দারিদ্র্যে শোকেবিপদে, সম্পদে-আনন্দে জলধরই ছিলেন তাঁদের প্রধান সহায় ও অবলম্বন। ছাপাখানা-সংক্রান্ত

বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে কাঙাল-পুত্রের চিঠি থেকেও এই নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়:

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জলকাকা, পত্র লিখিলাম, উত্তর নাই, ভাবিলাম কাগজ প্রকাশের পর উত্তর পাইব। তাহা যখন পাই নাই, তখন বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা। বিরক্ত হইলেও আমরা ছাড়ি কৈ? এবাবেও পত্র লিখিলাম, ইহার পর আর কি করিবেন দেখি। প্রেসে কাপি রাখা সম্বন্ধে বেশ গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। হিতকরী সম্পাদকের ইচ্ছে, প্রবন্ধ প্রকাশের পর কাপি ফেরত লন। আমি বলি, প্রিণ্টার কি কাপি ছাড়িয়া দেবে? জ্যোতিঃবাবু আপনাদের দোহাই দেন, বঙ্কুবাবু আপনাকে পত্র লিখিতে বলিয়াছেন। আমি পূর্ব্বাপরই বলিতেছি, প্রেস এবং কাগজের সত্ত্বাধিকারী স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। একজন হইলে গোল-যোগের কথা নাই, ঘটনাক্রমে যদি কোন মোকদ্দমা হয়, তাহা হইলে কেবল সম্পাদকের অর্ডার প্রুবে কি দোষ স্খলন হইবে? তাহাই জিজ্ঞাস্য।... গ্রামবার্ত্তা যখন, কলিকাতায় ছাপা হইত, তখন প্রেস অধ্যক্ষ [কাপি সম্পাদককে] দিতেন না। আপনি এ সম্বন্ধে বিশারদ কাব্যবিশারদকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দেবেন। অপেক্ষায় তাঁহাদের পত্রের উত্তর দি [ই] নাই। পূর্ব্ব পত্রের উত্তর দেবেন? পুস্তক কতদূর? অন্যান্য কুশল? ১৩০৭। ১৫ই বৈশাখ।[১২৭]

সেবক

সতীশচন্দ্র মজুমদার।

হরিনাথ তাঁর তিন প্রিয় শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও জলধর সেনকে যথাক্রমে 'ফিকির', 'ফকির' ও 'মুসাফির' নামে অভি-হিত করেছিলেন।[১২৮] এই 'মুসাফির' জন্ম-নাম, শিক্ষা, বিবাহ, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এবং জীবনের আদর্শের জন্য হরিনাথের কাছে গভীরভাবে ঋণী। বিশেষ করে লেখক হওয়ার প্রেরণা হরিনাথের কাছ থেকেই এসেছিল। লিখেছেন তিনি:

...... মধ্যে মধ্যে অবসরকালে যে সামান্য সাহিত্য-সেবা করি, হরিনাথ তাহার আদিগুরু, তিনি হারত ধরিয়া আমাদিগকে লিখিতে শিখাইয়াছেন, শেষজীবনেও লেখা সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন।[১২৯]

জলধরের জীবনে সরলতা ও সহজ-প্রবণতার যে আদর্শ তার মূলেও আছে হরিনাথের শিক্ষা ও প্রেরণা। জলধরের এক গুণগ্রাহী লিখেছেন:

কাঙ্গাল হরিনাথের গানের একটি লাইন জলধরবাবু জীবনে গ্রহণ করেচেন বলে মনে হয়। সেই লাইনটি হচেচ এই, 'বোঝ সোজা, চল সোজা'। ......

জলধরবাবু একদিন এই কাঙ্গালের যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর জীবনে বৃথা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় উত্তীর্ণ; তাঁর সঙ্গী এবং সহচরদের আর বড় কেউ বেঁচে নেই—এক তিনি আছেন, আর সম্মুখে আছেন কাঙ্গাল হরিনাথ। এই কাঙ্গালই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।[১৩০]

জলধর-মানসে কাঙাল হরিনাথের প্রভাব কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে এবং উত্তরকালে জলধর কীভাবে গুরু-কৃত্য করেছেন সে-সম্পর্কে এই প্রতিবেদন প্রণিধানযোগ্য:

জলধর সেনের চরিত্র এবং তাঁহার রচিত সাহিত্যের মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। ইনিই ছিলেন জলধর সেনের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু।...

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহাদের নীরব সাধনায় নব্য বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম ...।... তখনকার দিনে বহু শিক্ষিত যুবকও কাঙ্গাল হরিনাথের মহান চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও জলধর সেন এইরূপে কাঙ্গাল হরিনাথের শিষ্য হইয়াছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'তেই জলধর সেনের রচনার হাতেখড়ি হইয়াছিল; তাঁহার চরিত্রের উপর—কাঙ্গাল হরিনাথের আদর্শই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জলধর সেন

'কাঙ্গাল হরিনাথের' জীবনী লিখিয়া ও তাঁহার সঙ্গীতসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া শিক্ষাগুরুর ঋণ কিয়দংশে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১৩১]

জলধরের মানসলোকে একান্তভাবেই কাঙ্গাল হরিনাথের রচনা। তাই জলধরের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পাদর্শের উৎস সন্ধান করতে গেলে হরিনাথের সমীপবর্তী হতে হয়। জলধরের জীবনে হরিনাথের সার্বিক প্রভাবের কথাটি স্মরণে রেখেই তাঁর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা

যে-তীব্র লোককল্যাণকামনা ও সমাজহিতপ্রয়াস কাঙাল হরিনাথের চরিত্রের অন্তর্গত ছিলো তা জলধরের জীবনে সম্যক অনুশীলিত হয়নি।

> অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাবোধ, অন্যায়-অবিচার-শোষণ-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার-কামনা, স্বদেশ ও জনগণ সম্পর্কে আগ্রহ, সমাজের উন্নয়ন-চিন্তা, সমাজ-বিকাশের ধারায় কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বীকৃতি ও গুরুত্ব অনুধাবন কাঙাল হরিনাথকে উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।[১৩২]

কিন্তু হরিনাথের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্রের প্রতিবাদীবিপ্লবী উপাদান এবং স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন মনোভাব জলধরের মধ্যে অনুপস্থিত ছিলো এবং তা অর্জনের সাধ্য ও সাহসও তাঁর ছিলো না।

সমাজচেতনার কোনো গভীর বা তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় জলধরের সাহিত্য সৃষ্টি বা ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে পাওয়া যায় না। কেবল তাঁর গল্প-উপন্যাসে নারীজীবনের বেদনা-বঞ্চনা ও পুরুষশাসিত সমাজের হৃদয়হীনতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বা ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু এ-কথা মানতেই হয় যে, জলধরের সমাজ-বীক্ষণের দৃষ্টি ততো গভীর ছিলো না।

জলধরের স্বদেশ-চেতনা ও রাজনীতি-চিন্তার কিছু আভাস তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। কলেজজীবনে "সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ও কালীচরণের বক্তৃতা শুনে, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি হব, দেশের মধ্যে দশজনের একজন হব" বলে তাঁর যে,

আকাঙ্ক্ষা ছিলো তা গোয়ালন্দে স্কুল-শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করায় "ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।"[১৩৩] বলে আফসোস্ করেছেন। অবশ্য এই গোয়ালন্দেই তিনি ক্রমে রাজনীতির সঙ্গে কিছুটা যুক্ত হয়ে পড়েন। বলেছেন তিনি:

> খাই-দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব্ব সংস্কারবশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি।[১৩৪]

এই গোয়ালন্দ মহকুমার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। স্মৃতিচারণায় বলেছেন:

> ১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির অস্তিত্ব লোপ পায় নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W C. Bonerji) সেই কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেসকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্ব্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্যন্ত এই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও, আমায় প্রবাস স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।[১৩৫]

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের মুদ্রিত রিপোর্টে জলধরের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছিল—'ভূস্বামী—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের গোয়ালন্দ শাখার প্রতিনিধি' ('বসুমতী'. আষাঢ় ১৩৪৩; পৃঃ ৩৭৫)। এই অধিবেশনে জলধর অনেক দেশখ্যাত রাজনীতিবিদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানেই তরুণ দেশকর্মী অশ্বিনীকুমার দত্তকে (১৮৫৬—১৯২৩) দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

কিন্তু রাজনীতির প্রতি জলধরের খুব একটা আগ্রহ ছিলো না, এ-বিষয়ে খুব সিরিয়াসও ছিলেন না তিনি। অনেকটাই বয়সের উন্মাদনায়,

শখ আর কৌতূহলের বশে এ-সব কর্মকাণ্ডে তিনি খুবই সাময়িকভাবে জড়িত হন:

> ভারত উদ্ধার করে' যথাকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। আবার 'সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই একঘর।' রাজনীতি তখন ধামা-চাপা রইল। সংসারযাত্রা যথানিয়মে চল্‌তে লাগল।[১৩৬]

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে 'কংগ্রেসের মতপ্রচারের জন্য' অশ্বিনীকুমার দত্ত গোয়ালন্দে এসে জলধরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সুবাদে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ জন্মে। জলধরের উদ্যোগেই গোয়ালন্দে অশ্বিনীকুমারের অভ্যর্থনা ও জনসভার ব্যবস্থা হয়। জনসভায় অশ্বিনীকুমার 'দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। সবশেষে জলধর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আয়োজনের পারিপাট্য ও জনসমাগমে সভাটি বিশেষ সফল হয়। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের প্রত্যক্ষ সাহচর্য ও প্রভাব সত্ত্বেও কংগ্রেসের কার্যক্রমে জলধর আগ্রহী বা এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন নি। তবে তিনি কংগ্রেসকে 'দেশের মুক্তিকামী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে গণ্য করতেন। সে-কারণে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কংগ্রেস-বিরোধিতা তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি। ফলে তাঁকে 'বঙ্গবাসী'র কাজ ছাড়তে হয়েছিল।[১৩৭]

স্বদেশী আন্দোলনে জলধরের প্রত্যক্ষ সংযোগের পরিচয় পাওয়া না গেলেও এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর যে কিছুটা প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত ছিলো তা বেশ বোঝা যায়। ১৯০৫ সালে জলধরের সম্পাদনায় 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' নামে স্বদেশী গানের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। একশোটি স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় উদ্দীপনামূলক গানের মধ্যে ছিলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্', রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'-সহ স্বদেশীযুগের বিখ্যাত চব্বিশটি গান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত-সন্তান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান', রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,' অতুলপ্রসাদ সেনের 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মি উঠ আদি-জগতজন-পূজ্যা' প্রভৃতি। এটি জলধরের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। স্বদেশীযুগের আবহাওয়াই যে এই সংকলনের মূল প্রেরণা এ-বিষয়ে সংশয় নেই।

কাঙাল হরিনাথের 'এই কি সেই আর্য্যভূমি আমরা কি সেই আর্য্য-সন্তান'—এই গানটির প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বঙ্কিমচন্দ্র সেন (১৮৯২—১৯৬৮) বলেছেন:

> ···ফকীর ফিকীরচাঁদের গানের ভিতর দেশের প্রতি আন্তরিক দরদের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, জলধরদাদার লেখাতেও সেই দরদের পরিচয় পাই এবং সেই সূত্রেই জলধরদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি।[১৩৮]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১২) রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে উদ্দীপনামূলক জাতীয়তাবোধের আভাস থাকায় ইংরেজ সরকার এর মঞ্চায়নের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। শেষ পর্যন্ত জলধর সেন ও সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতির মধ্যস্থতায় নাটকটি পুলিশ অফিসের ছাড়পত্র লাভ করে।[১৩৯] এই উদ্যোগের পেছনে সাহিত্যিক কর্তব্যবোধের অতিরিক্ত একটি চেতনা কাজ করেছিল বলে অনুমান করা চলে।

তবে উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীর স্ববিরোধ ও মানসদ্বন্দ্ব থেকে জলধর সেন মুক্ত ছিলেন না। রাজস্তুতি বা ইংরেজ-শাসনকে আশীর্বাদ বলে মান্য করা বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবের একান্ত অন্তর্গত ছিলো। জলধরের স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবোধের সঙ্গে অবিচল রাজভক্তি ও রাজানুগ্রহ-লাভের চিন্তা-চেতনার কোনো সংঘাত হয়নি। এ-দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তাঁর যুগ ও শ্রেণীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি।

ইংরেজ-শাসনের স্থায়িত্ব-কামনা, রাজপুরুষের প্রশস্তিকীর্তন, রানীমাতার কাছে অবেদন-নিবেদন-প্রতিকার প্রার্থনার ভেতর দিয়ে জলধর তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করেছে। এ-দিক দিয়ে গুরু কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু হরিনাথের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য এই যে কাঙাল রাজসম্মান, আর্থিক সুযোগ বা অন্য কোনো ধরনের সুবিধা অর্জনের প্রত্যাশী ছিলেন না বলে সামাজিক দায়িত্ব পালনে তুলনায় অধিক নির্ভীকতা, বলিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে (২ ডিসেম্বর ১৮৮৪) জলধর সেনের নেতৃত্বে ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল কাঙাল-রচিত রিপন-প্রশস্তি তাঁকে নিবেদন করার জন্য পোড়াদহ রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হন। 'রাজভক্তি সরলতা ভারতবাসীর ধন"—কাঙালের এই আন্তরিক

বিশ্বাস সেদিন সুরে সুরে ঘোষিত হয়েছিল রেলস্টেশনে জলধরের উদ্যোগী পরিচালনায়। জলধরের নিজের কথায় জানা যায়:

> সৌভাগ্যক্রমে আমি ঐ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম, এবং আমিই ফিকির-চাঁদের দলে প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর আমি স্বয়ং কলিকাতায় গমন করিয়া, ফিকিরচাঁদের ঐ গান যথারীতি বড়লাট বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করি।[১৪০]

বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী উক্ত 'অভিনন্দন-গীতি'র প্রাপ্তি-স্বীকার করে প্রীত বড়লাটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। উত্তরকালে জলধর রাজানুগত্যের পুরস্কারও পেয়েছিলেন 'রায়বাহদুর' উপাধিলাভের ভেতর দিয়ে।

'হিতবাদী' পত্রিকা ছিলো ইংরেজ-সরকারের সমালোচক ও জাতীয়তা-বাদী চেতনার প্রতিপোষক। কিন্তু জলধর এই পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণের পর ক্রমশ পত্রিকার বলিষ্ঠ নীতি থেকে সরে আসেন। ফলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল যে, তাঁর সম্পাদিত 'হিতবাদী'র 'সুর নরম' হয়েছে এবং পূর্বতন সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার নীতি ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে 'হিতবাদী' পত্রিকার রাজনৈতিক মতামত যা ক্রমশ সরকার বিরোধী হয়ে উঠছিল তা অনুমোদন করা শান্ত-নিরীহ-নির্বিবাদী সর্বোপরি অকৃত্রিম রাজভক্ত জলধরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জলধর কার্যত্যাগের পর 'হিতবাদী'র বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে যখন 'রাজদ্রোহে'র অভিযোগ উত্থাপিত হয় জলধর তখন এই বিষয়টিকে সীমা-অতিক্রমের যথার্থ শাস্তি বলেই মনে করেছিলেন।[১৪১]

হরিনাথের মৃত্যুর পরপরই এক প্রবন্ধে জলধর কিছুটা আফসোস, কিছুটা বেদনা, অপারগতা ও ব্যর্থতার সুর মিশিয়ে বলেছিলেন:

> যদি তাঁহারই (হরিনাথ) নির্দ্দেশমত দেশের জন্য—আর্ত্ত, পীড়িত, বিপন্নের জন্য কিছুও খাটিতে পারিতাম।[১৪২]

তাঁর অক্ষমতার এই সরল স্বীকারোক্তি এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে, যে-কারণেই হোক স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে চিন্তা-কর্তব্যের বিষয়ে তাঁর প্রত্যাশিত ভূমিকা পালিত হয়নি।

জলধর সেনের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সমকালীন প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট তীব্রই হয়েছিল। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। তিনি সেই বিরল সাহিত্যশিল্পীদের অন্যতম যাঁরা প্রথম রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্রশংস স্বীকৃতির দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন।

মহিষাদলে শিক্ষকতাকালে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় জলধরের হিমালয়-ভ্রমণের কাহিনী 'ভারতী' পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। জলধরের এই ভ্রমণ-কথা পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। 'ভারতী'-সম্পাদক সরলা দেবী জলধরকে পাঠকের এই প্রতিক্রিয়ার কথা। জানিয়ে দেন। অবশ্য পাঠকসমাজ এই রচনার প্রকৃত লেখক যে কে সে-সম্বন্ধে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন। জলধরের ভাষায়:

> হিমালয়ের কথা তাহার পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই, তাই আমার লেখা যা তা-ই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাসপল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন' নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুরবাড়ীর কেহ ছদ্মনামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন।[১৪৩]

জলধরের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল হিমালয়-বিষয়ক ভ্রমণ-কথায়। তাঁর এই রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জন করে। এ-বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য সংগ্রহ করলেই সমকালীন প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটির বোঝা যাবে।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হিমালয়-কথার শেষ কিস্তির সমালোচনায় 'সাহিত্য' (বৈশাখ ১৩০৫; পৃঃ ৭২) পত্রিকা মন্তব্য করে:

> 'প্রত্যাবর্ত্তন' শ্রীযুক্ত জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণের উপসংহার। এই সংখ্যায় সেই চিরমধুর ভ্রমণকাহিনীর সমাপ্তি। বিভিন্ন দৃশ্য, বিবিধ ভাব ও বিচিত্র কাহিনীর স্তরে স্তরে লেখক নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া এতদিনে পাঠকের সঙ্গে যে নিভৃত নিগূঢ় প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন,—তাহার যেন সমাপ্তি না হয়। হিমালয়-ভ্রমণ-লেখকের অদৃষ্টে অন্য পুরস্কার এ দেশে দুর্লভ. কিন্তু বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকসম্প্রদায়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তঁহার প্রাপ্য।

প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন :

আমরা যখন কিশোর বয়স্ক সেইসময়ে সেকালের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র— 'ভারতী' ও 'সাহিত্য'-এ জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত এবং আমরা অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে ঐগুলি পড়িতাম; 'ক্রমশ-প্রকাশ্য' ডিটেকটিভ উপন্যাসের পরবর্ত্তী অধ্যায় পড়িবার জন্য লোকের যেরূপ অধীর আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, জলধর সেনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রায় সেইরূপ আগ্রহই আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিত।[১৪৪]

জলধরের রচনার আকর্ষণ যে কতো তীব্র ছিলো তার সাক্ষ্য মেলে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বক্তব্যে :

'ভারতী'তে শ্রদ্ধাস্পদ জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণ সাগ্রহে পাঠ করতুম। 'প্রদীপ' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিকপত্রেও তাঁর আরো অনেক ভ্রমণ-কাহিনী আমাকে বাস্তব রূপকথার মতন আনন্দ দিত। তার আগেও বাংলাভাষায় আরো অনেক ভ্রমণ-কহিনী বেরিয়েছে, কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতরে যে কতখানি মৌলিকতা, সরল লেখার কায়দা, তাজা আনন্দ ও আন্তরিকতা এবং উপন্যাসের উত্তেজনা থাকতে পারে, জলধরবাবুর রচনাগুলিই বাঙালীকে সর্ব্বপ্রথমে তা দেখিয়ে দিলে। আমার তরুণ মনের ভিতরে তিনি তুষার-শিখরী হিমাচলের যে অভাবিত সৌন্দর্য্য বৃষ্টি করতেন, আজও তা মলিন হয়নি।[১৪৫]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

'হিমালয়' ও 'প্রবাস-চিত্র' এই দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ ছেলেবেলায় যখন প্রথম পাঠ করি, তখন এটা অনির্ব্বচনীয় রসানন্দে মনপ্রাণকে ভরিয়া দিয়াছিল, এই দুইখানি বইয়ে এক চির-ইপ্সিত অজানা জগতের অভাব যেন আনিয়া দিয়াছিল।[১৪৬]

জলধরের ভ্রমণসাহিত্যের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা যে-কোনো লেখকের জন্য ঈর্ষণীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'হিমালয়ের বাক্যচিত্র পড়ে' একজনের মন "হিমালয়দর্শনের জন্য উৎসুক হ'য়েছিল'।[১৪৭] আবার 'হিমালয়' পাঠ করে একজন পাঠকের মনে হয়েছিল, 'আমি যেন দাদার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ করিতেছি'।[১৪৮] আরেকজন পাঠক বলেছেন, 'ভূগোল-বর্ণিত চির-রহস্যাবৃত হিমালয়কে তাঁহার 'হিমালয়' যেন আমাদের নিকটবর্ত্তী

করিয়া দিয়াছিল'।[১৪৯] নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর কৈশোরে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) জলধরের 'চন্দ্রভাগা-তীরে' নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করে মুগ্ধ ও অভিভূত হন। বলেছেন তিনি, "প্রবন্ধ-শেষে তিনি একটি অতিথিপরায়ণ দরিদ্র কৃষক-পরিবারের যে চিত্র অঙ্কন করেন, সে চিত্র এত পরিস্ফুট, এত মর্ম্মগ্রাহী যে আজ সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই।"[১৫০]

জলধরের হিমালয় ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে পরবর্তীসময়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাঁর এককালের সুহৃদ্ ও এই ভ্রমণকথা প্রকাশের উদ্যোক্তা দীনেন্দ্রকুমার রায়। তিনি চাঞ্চল্যকর এক ঘোষণায় দাবী করেন যে, জলধরের নামে প্রচারিত হিমালয় ভ্রমণ-কথার প্রকৃত লেখক তিনি। দীনেন্দ্রকুমার সূত্রে জানা যায়, জলধরের সংক্ষিপ্ত ডাইরীকে কেন্দ্র করে তিনি 'হিমালয়' রচনা করেন। স্মৃতিচর্চায় এ-বিষয়ে বলেছেন :

> ···ক্রমশঃ সেই ৭০/৭৫ পৃষ্ঠা কাপি হইতে হিমালয়ের মত অতবড় কেতাব, কেবল তাঁহার ডায়েরীর অস্থি-কঙ্কালের উপর, আমার ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে আসমানের কেল্লার মত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। তাঁহার নামের জন্য, তাঁহার কেতাবখানি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, সাহিত্য-সমাজে পুস্তকখানি যাহাতে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে আমি দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। অনেক স্থানেই আমার খেই হারাইয়া যাইত; কখন হিমালয়ে যাই নাই, হিমালয় দেখি নাই, কি লিখিতে কি লিখিব ভাবিয়া পাইতাম না; মূল কপিতে যেটুকু বর্ণনা পাইতাম তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন।..তথাপি স্বীকার করিব—পুস্তকখানির যদি কিছু গুণ থাকে—তবে তাহা তাঁহারই প্রাপ্য, এবং যতকিছু দোষ, ত্রুটি—সমস্তই এই অধম, একুশ বৎসর বয়সের অপরিণামদর্শী অক্ষম বালক লেখকের। যাহা হউক, জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণের শুভ্র অস্থি-কঙ্কালের উপর এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল।[১৫১]

দীনেন্দ্রকুমার আরো বলেছেন, 'এই মূল্যবান বৃহৎ ['হিমালয়'] কোন স্থানে (কেবল 'নিবেদন' ব্যতীত) একটি ছত্রও জলধরবাবুকে স্বয়ং লিখিতে না

হইলেও তাহা তিনি কোথাও স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই'।[১৫২] এ-বিষয়ে তিনি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে সাক্ষী মেনেছেন। সুরেশচন্দ্র নাকি দীনেন্দ্রকুমারকে বলেছিলেন, 'জলধরবাবুর হিমালয় ত লিখিয়া দিলেন, আপনার নাম কেহ জানিল না; আপনি কি পরিশ্রম করিলেন, তাহা কেহ বুঝিল না; কিন্তু আপনার রচনাভঙ্গী, লেখার বিশেষত্ব এবং ভাবপ্রকাশের মধ্যে আপনার যে individuality জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, জলধরবাবু কি করিয়া তাহা নিজস্ব বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন?"[১৫৩]

জলধরের আরেকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ 'প্রবাস-চিত্র' সম্পর্কেও দীনেন্দ্রকুমার একই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথায় এ-সম্পর্কে লিখেছেন:

> কেবল হিমালয়েই শেষ নহে; তাঁহার রচিত 'প্রবাস-চিত্র' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তখানির বিবিধ প্রবন্ধ সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছিল; হিমালয়ের পর সেই ভারও আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু—এবং জলধরবাবুরও সুহৃদ সুকবি স্বর্গীয় রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর (ভারতীয় ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল) আমাকে একদন বলেছিলেন, 'প্রবাসচিত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতেছি জলধর সেন। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, ভাষা, প্রত্যেক লাইন আপনার, হিমালয় যেমন জলধরবাবুর রচনা, এখানিও তাই?'...তবে যাহারা জলধরবাবুর রচনার সহিত পরিচিত, তাঁহারা 'হিমালয়ে' ও 'প্রবাসচিত্রে' জলধরবাবুর নিজস্ব রসমাধুর্য্যের, এমন কি, তাঁহার ভাষার অননুকরণীয় সরলতার পরিচয় না পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। চন্দননগরের সুবিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠকে একদিন এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। একজনের কণ্ঠ হইতে অন্যের বেসুরো কণ্ঠস্বর নিঃসারিত হইলে বিস্মিত হইবারই কথা।[১৫৪]

দীনেন্দ্রকুমার তাঁর অভিযোগের উপসংহারে আরো বলেছেন:

আমার অনভিজ্ঞতাবশতঃ এবং জলধরবাবুর ঔদাসীন্যে, হিমালয়ের বর্ণনায় যে সকল ত্রুটি, ভ্রম এবং স্থানীয় চিত্রে যে সকল বিরাট অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, তাহা যখন ধরা পড়িল ও আলোচনার বিষয়ীভূত

হইল, তখন গ্রন্থকার ত অনায়াসেই বলিতে পারিতেন—ও পুথি ত আমি লিখি নাই; একটা অর্ব্বাচীন বালক আমার খাতাপত্র হাঁটকাইয়া নিজের ইচ্ছায় যা তা লিখিয়া ও আমার নামে ছাপিয়া আমাকে অপদস্থ করিয়াছে।—কিন্তু সে কথা বলিতে কোনও দিন কি তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল? যে পুস্তকের আটদশটা সংস্করণ ছাপা হইল, কোন সংস্করণে তাহার ত্রুটি কি তিনি সংশোধন করিতে পারিতেন না?—আমি ভূতের ব্যাগার না খাটিলে উহা আদৌ ছাপা হইত কিনা, তাহা তিনি ভালই জানেন।[১০৫]

জলধর সেন স্বয়ং দীনেন্দ্রকুমারের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন 'বসুমতী' পত্রিকায় ('দুটী কথা', আশ্বিন ১৩৪০)। কবি নরেন্দ্র দেবও দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্য খণ্ডন করে দীর্ঘ প্রতিবাদ-নিবন্ধ রচনা করেন ('হিমালয়ে'র রচয়িতা': 'বসুমতী', অগ্রহায়ণ ১৩৪০)। দীনেন্দ্রকুমার 'বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো' নামে তার পাল্টা জবাব দিয়ে তাঁর পূর্ব-অভিযোগের ভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা করেন ('বসুমতী', পৌষ ১৩৪০)। নরেন্দ্র দেব পুনরায় 'গুরু-দক্ষিণা' নামে দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্যের দীর্ঘ প্রতিবাদ করেন ('বসুমতী', মাঘ ১৩৪০)। ১৩৪০ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বসুমতী'তে পত্র লিখে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রীতি ও স্নেহের অস্ত্র ব্যবহারে' জলধর-দীনেন্দ্রর এই অপ্রীতিকর দ্বন্দ্বের অবসান কামনা করেছিলেন। যাই হোক, জলধরের 'হিমালয়' ও 'প্রবাস-চিত্র' বই দু-খানা নিয়ে দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্য সে-সময়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তবে তাঁর এই অভিযোগ সাহিত্যিক মহলে গৃহীত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এতে দুজনের দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অবসান ঘটে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় এই 'হিমালয়'-বিতর্ক সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

আসলে বন্ধুর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, রাজদ্বারে তাঁর সম্মান দেখে প্রায়-নির্বাপিত দীনেন্দ্রবাবুর মনে জেগে উঠে ছিল দারুণ ঈর্ষা।[১০৬]

জলধর-দীনেন্দ্রর এই দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় জলধরের 'স্মৃতি-তর্পণ' নামীয় লেখাকে কেন্দ্র করে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (কার্তিক-১৩৪২ হতে ভাদ্র-১৩৪৩) এগারো কিস্তিতে 'স্মৃতি-তর্পণ' নামে জলধরের স্মৃতি-চর্চামূলক এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। এই স্মৃতিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই

দীনেন্দ্রকুমার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন 'বসুমতী' পত্রিকায় 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা' নামে (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৪৩)। তাঁর এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে তিনি জলধরের বেশ কিছু বক্তব্য যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা করেন। অবশ্য দীনেন্দ্রকুমারের সব বক্তব্যই যে যৌক্তিক বা সমীচীন এ-কথা বলা চলে না। তবে তিনি এমন কিছু ভ্রান্তি-নির্দেশ করেন যা জল-ধরকেও স্বীকার করতে হয়। এই প্রতিবাদে দীনেন্দ্রকুমার বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-শ্লেষ ব্যবহার করে জলধরকে সরাসরি আক্রমণ করেন। যেমন:

> কিন্তু সত্য বলিতে কি, রায়বাহাদুর এ সুপ্রবীণ বয়সেও যে চিরাচরিত মিথ্যার বেসাতি সমভাবে চালাইতেছেন, তাহা মনে করিতে পারি নাই। জলধরবাবুর মত অসত্যসন্ধ কীর্তিধ্বজ পুরুষের জীবন-স্মৃতির মহিমা-সিন্ধুতে পাছে বিন্দুমাত্র সত্যের আলোক পরিস্ফুট হইয়া উঠে—সত্যের আভাসমাত্র দেখিয়াই শিক্ষিতসমাজ বিভ্রান্ত হন—সেইজন্য আবার আদিপর্বে অনুবর্ত্তন করিতে হইল।[১৫৭]

'তৃতীয় প্রস্তাবে'র উপসংহারে তিনি লিখেছেন:

> মহালয়ার তর্পণ-পর্ব্বের পূর্ব্বেই রায়বাহাদুর স্মৃতিতর্পণ সমাপন করিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর 'মাসিক বসুমতীতে' যদি জলধরবাবুর জীবনস্মৃতি-মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতে গদাপর্ব্ব পর্য্যন্ত—বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার শিখণ্ডীলীলার মহিমা বিশ্লেষণের সুযোগ না পাই—অন্যত্র প্রয়াস পাইব।
>
> জলধরবাবু!—
>
> 'কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
> কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?'[১৫৮]

জলধর সেন দীনেন্দ্রকুমারের এই দীর্ঘ প্রতিবাদ-প্রবন্ধমালার একটি জবার দেন 'আমার 'স্মৃতিতর্পণ' সম্বন্ধে দু'একটি কথা' শিরোনামে (বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৩)। স্বভাবতই অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত মনেই তাঁকে জবাব লিখিতে হয়েছিল:

> বয়স আমার আশীর কোঠায় গড়িয়ে আসছে। জীবন-প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়। এ সময় এরূপ অকারণ বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমার নেই।

কিন্তু জলধরের বক্তব্য দীনেন্দ্রকুমারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই তিনি জলধরের এই জবাবকে কঠোর কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ করেছিলেন।

সমকালীন প্রতিক্রিয়ার এই অসাহিত্যিক রূপ প্রত্যক্ষ করে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৩৮) একবার মন্তব্য করেছিলেন:

> জলধরবাবুর মতো সজ্জনকে যারা অপদস্থ করতে চায়, তাদের ভগবান ক্ষমা করুন।[১৫৯]

রচনা-নিদর্শন

বদরিনাথ

২৯শে মে শুক্রবার।--কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হ'য়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ কল্লুম। আঘাতের পর প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম। বদরিনাথের পথে যখন চলছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এসে সে সমস্তই যেন সংযত হ'য়ে গেল। এই রকমই হ'য়ে থাকে।

পথে যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ক'রতে হয়েছে তখন মনে হয়েছিল। এই নিদারুণ যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্ম্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যেখানে পূজার্চ্চনা অবিরাম কলরবে, মানব-হৃদয়ের সুখদুঃখ ও হর্ষের বিপুল উচ্ছ্বাসে এক সুভীর কল্লোল উত্থিত হ'চ্ছে। নদী জলপ্রবাহ সমুদ্রের ফেনিল উর্ম্মিরাশির নির্ব্বোধ নৃত্যের মধ্যে মিশে যেমন হারিয়ে যায়, সেইরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে, নারায়ণের পুণ্য পীঠতলে, দেবমহিমার এক অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ব্যাকুল-বাসনা ও অশান্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন নিরাশ হ'য়ে প'ড়লুম;

বদরিনাথে প্রথম প্রবেশ ক'রেই চারিদিকে একটা নিরুদ্যম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হ'লো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে? একটা অলস কর্ম্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকানন্দা অতি নিরুদ্বেগে মন্থর গমনে বরফরাশির নীচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে; শহরের অধিকাংশ ঘরবাড়ী এখন পর্যান্তও বরফের তলায় প'ড়ে আছে। যে কয়খানা ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়; তাহা কতক বরফের প্রসাদাৎ, আর কতক আমাদের পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসী মহাশয়দের কৃপায়, আর কতগুলি ঘর এই তিন বৎসর কাল ধ'রে বন্ধ থাকা বশতঃ নষ্ট হ'য়ে গেছে; বিশেষ সন্ন্যাসী মহাশয়েরাই ক্ষতি করেছেন

কাঙ্গাল হরিনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীজলধর সেন

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

কাঙাল হরিনাথ' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

প্রবাস-চিত্র

শ্রীজলধর সেন

প্রণীত

কলিকাতা ;

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা

'প্রবাস-চিত্র' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২০

সম্পাদক

জলধর সেন, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যা:

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা : জলধর সেন সম্পাদিত

উৎস

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স্

মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

'উৎস' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

কিছু বেশী। ঘরের দরজা জানালাগুলি বেবাক অন্তর্হিত হ'য়েছে। অবশ্য সেগুলো যে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে তা নয়; যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রথমে এখানে এসেছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন তখনও হাটবাজার বসেনি, সুতরাং জ্বালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব; তাই আপনাদিগকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত জানালা দরজা ব্রহ্মাকে উপহার দিয়েছেন এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিসপত্র নাশ ক'রে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মহানীতি-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল—এই সমস্ত জানালা দরজার অভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে সকল যাত্রী আসবে, তারা এই বরফ-রাজ্যে এসে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাঁদের অবসর হয় নি।

পুরপ্রবেশ করবার পূর্ব্বে যে সকল পাণ্ডা আমাকে পেয়ে ব'সেছিল, তাদের হাত থেকে যে রকম ক'রে অব্যাহতি পেলুম, সে কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। বদরিনারায়ণে এসে কোথায় উঠবো তা লছমীনারায়ণ আমাদের দেবপ্রয়াগেই ব'লে দিয়েছিল। তাঁর শ্রীহস্ত লিখিত সেই ঠিকানা এখনও আমার ডায়রী বইয়ে আছে; তা এই—"কূর্ম্মধারাকি উপর মোকাম, লছমীনারায়ণ পাণ্ডা, বেণীপ্রসাদ রামনাথকী চাচী।"—প্রথম কথাগুলোর অর্থ বুঝেছিলুম যে, কূর্ম্মধারার উপরে লছমীনারায়ণ পাণ্ডার বাড়ী, আর সেখানে বেণীপ্রসাদ আছেন। তা সে বেণীপ্রসাদ মানুষই হোন্ আর লছমী-নারারণের গৃহবিগ্রহই হোন। কিন্তু শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিষ্কাশনে অসমর্থ হ'য়ে তখনই লছমী-নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম; কিন্তু কি কারণে জানিনে, উক্ত পাণ্ডাশ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান করানোর আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করে নি। আমার কৌতূহল প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয্য দেখে উপরন্তু ব'লেছিল, "রস উষো বাৎ বোলনেসেই ডেরা মালুম হোগা"—সুতরাং কথা আর মোটেই বোঝা হয়নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে সে দিন সমস্ত অপরাহ্ণটা এই কথার অর্থনির্ণয়ের জন্যে বৈদান্তিক ভায়ার সঙ্গে কিরূপ অনর্থক বাক্যব্যয় ক'রতে হয়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন, একজন সুরসিক ও ভারি সমজদার লোক; তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হ'লো এই বেণীপ্রসাদ লোকটা লছমীনারায়ণের হয় শ্যালক,

না হয় ভগিনীপতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুর রসাত্মক ব'লেই পাণ্ডার পো আমাদের কাছে তার মর্ম্মভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান ক'রেছিল। যা হ'ক বৈদান্তিক শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ক্ষান্ত হ'লেন না এবং আমিও এই অনুমানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ ক'রেছিলুম, সুতরাং তিনি কথাটার ধাতু ও শব্দগত অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। গভীর গবেষণা ও প্রচুর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির ক'ল্লেন যে, সেখানে বেণীপ্রসাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ী আছেন, কেন না "চাচী" শব্দের অর্থ খুড়ী ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না; কাজেই, 'রামনাথ কী চাচী' এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। তবে স্ত্রীলোকের নাম ধরে আড্ডা খুঁজতে হবে, এই যা মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লেগে রইল। বৈদান্তিক ব'লে বসলেন যায়গায় যায়গায় অমনতর দু'একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরুষের চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুল্য স্বয়ং লছমীনারায়ণ আমাদের সঙ্গে আস্‌তে পারে নি, কারণ সে আরও কয়দিন দেবপ্রয়াগে না থাকলে অনেক নূতন যাত্রী তার বেদখল হ'য়ে যাবে, তার এই ভয় ছিল; তবে সে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই সে আমাদের সঙ্গে এসে মিশবে। যা হোক বদরিনাথে এসে সেই "রামনাথকী চাচীর" অনুসন্ধানে বেশী নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি; সকল পাণ্ডাই তীর্থের কাকের মত রাস্তায় বসে থাকে; যখন তারা শুনলো যে, আমরা লছমীনারায়ণের লোক, তখন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণীপ্রসাদ ব'লে পরিচয় দিলে। বেণীপ্রসাদের আকার কি রকম তা আমরা কেহই জানতুম না, সুতরাং কলিকাতা কালীঘাট, কি ঐ প্রকার কোন স্থানে হ'লে স্বতঃই সন্দেহ হ'তো যে, হয় ত বা একটা জাল বেণীপ্রসাদ এসে আমাদের স্কন্ধে ভর ক'রেছে এবং গোলযোগের মধ্যে যখন আসল বেণীপ্রসাদটা বেরিয়ে প'ড়বে তখন আমাদের এক বিষম মুস্কিলে প'ড়তে হবে। কিন্তু বদরিনাথের মত স্থানের এখনও ততটা অধঃপতন হয় নি। সুতরাং লোকটা বেণীপ্রসাদ ব'লে পরিচয় দেবামাত্র আমরা অসঙ্কোচে তার সঙ্গে চ'ল্‌তে লাগলুম।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ বেচারীও আমাদের নিয়ে মহা বিপদে প'ড়লো। তাদের ঘরবাড়ী এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনের ষোল দিন না গেলে তারা বরফস্তূপের মধ্য হ'তে প্রকাশ হ'চ্ছে না। বেণীপ্রসাদ নিজে অন্য লোকের একটা কুঠরী দখল ক'রে বাস ক'চ্ছে; সুতরাং এ রকম অবস্থায়

সে আমাদের কোথায় রাখে, এই ভাবনাতে অস্থির হ'য়ে প'ড়লো। যা হোক, শেষে সে পাহাড়ের উপর আর একজনের একটা ঘরে আমাদের আড্ডা স্থির ক'রে দিলে। এই ঘর যার সে তখনও এখানে এসে পৌঁছে নি; আমাদের আশঙ্কা হ'তে লাগলো, ঘরওয়ালা হঠাৎ এসে আমাদের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে; কারণ, এরা বিলক্ষণ অতিথিপরায়ণ হ'য়েও অতিথিসেবার পুণ্যটুকু ভোগ ক'রবে, এদের পক্ষে তা অসহ্য। কিন্তু অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়াতে কোন লাভ নেই ভেবে আমরা সেই ঘরে আড্ডা গড়বার যোগাড় ক'রে নিলুম। ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু তার অভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয়; দ্বারগুলি পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসীদের অগ্নিসেবায় লেগেছে। রাত্রে দুর্জ্জয় শীত আসছে; তখন এই ঘরে কি ক'রে তিষ্ঠান যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লুম। সন্ধ্যা হ'তেও আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনলুম অপরাহ্নে নারায়ণের দ্বার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সুতরাং রাত্রিযাপনের জন্যে আগুনের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হ'তেই বড় শীত বোধ হ'তে লাগল এবং সর্ব্বশরীর পুরু কম্বলে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শীতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালিদাসকে কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিল "মাঘে শীত, না মেঘে শীত।"—তার উত্তরে কবিবর নাকি ব'লেছিলেন, "যত্র বায়ু তত্র শীত।" কখন বদরিকাশ্রম দর্শন করতে এলে কালিদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নিশ্চয়ই লজ্জিত হ'তেন। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে বায়ু প্রবাহশূন্য স্থানেও যে রকম মারাত্মক শীত, তা কবি প্রতিভার আয়ত্তীভূত নয়; যে সকল পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রী এ সকল স্থানে আসে, তারাই তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। তবু ত এ মে মাস, মাঘমাসের প্রবল শীত অনুমান করবার শক্তি মানুষের নাই। আমরা বহুকষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বাললুম এবং তার পাশেই শয্যারচনা করা গেল। সে রাত্রে কিছুই আহার হ'ল না।

হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে এত দূরে জনমানবশূন্য চিরতুষাররাশির ভিতরে এতখানি সমতলভূমি দেখলে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার থেকে যাত্রা ক'রে এতদূর এসেছি, এর মধ্যে যা কিছু অল্প সমতল জমি দেখেছি তা শ্রীনগরে ভিন্ন সমস্ত যায়গাই "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" অষ্টাবক্রবিশেষ।

হরিদ্বার হ'তে বদরিকাশ্রম দুই শত মাইলেরও বেশী। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী গম্ভীর; এ গাম্ভীর্য্যের সহিত স্বতঃই সাগরের গাম্ভীর্য্য তুলনা ক'রতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই দুই জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের তফাৎ। একটি মহা উচচ, আসমান, সুদীর্ঘ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি—আর একটি সুগভীর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন, তবু এ দুইয়ের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে, তাহা ঠিক বলা যায় না; বোধ কারি, এ উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে; এই মহান সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্ব-পিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটি দেখে আর একটির কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গভীর দৃশ্য তার উপর বদরিকা-শ্রমের দৃশ্যটা আরও গভীর। দু' দিকে দুটো পর্ব্বত একেবারে আকাশ ভেদ ক'রে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধ ছায়া বদরিকাশ্রমকে ছেকে ফেলেছে। পাণ্ডাদের মুখে শুনলুম, এই পর্ব্বতের একটির "নর" অপরটির নাম "নারায়ণ"। আরও শুনলুম, এই পর্ব্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হ'চ্ছে। শাস্ত্রে না কি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্দ্ধিত-কলেবর হ'য়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেলবে, সুতরাং বদরিকাশ্রম তীর্থ চিরদিনের মত হিমালয়ের পাষাণ-বক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পাণ্ডারা এই ভরসা করে যে দু'চারশো বছরের মধ্যে সে রকম দুর্ঘটনা ঘটাবার কোন সম্ভাবনা নেই; কাজেই আশু দারিদ্র্যতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ; তবে তাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা রইল বটে।

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা অতি সুন্দর। শুধু ভক্তের নয়, কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে। এই পুণ্যভূমি ভেদ ক'রে অলকানন্দা প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু বছরের বেশী সময়ই তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এখন ইহা বরফে ঢাকা। আরও কিছুদিন পরে বরফ গ'লে তার ললিত তরল স্রোতে ভেসে যাবে। সে দৃশ্য ভারি সুন্দর।

(হিমালয়)

বড়-দিদি।

তোমাদের মা আছে, বাপ আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, বন্ধুবান্ধব আছে;—তোমাদিগকে কেমন করিয়া বুঝাইব বড়-দিদি আমার কে?

এ সংসারে আমি শ্রীঅনাথবন্ধু মিত্র, আমার কেহ নাই—সত্যসত্যই কেহ নাই—আছেন কেবল এক বড়দিদি। তুমি যখন মা বলিয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হও, আমি তখন ভাবি মা আবার কে? মা ত বড়-দিদি। তোমরা মা বলিয়া যে আনন্দ পাও, আমি দিনান্তে পরিশ্রান্ত দেহে বাড়ীতে আসিয়া 'বড়দি" বলিয়া তাহার অধিক আনন্দ, ততোধিক শান্তি পাই। বড়-দিদি আমার সব; এ সংসারে আমি জানি এক বড়-দিদি। আর কাহারও অভাব কোন দিন আমার মনে হয় নাই।

আমার বয়স এই ২০ বৎসর। কলিকাতা সহরে আমাদের বাড়ী। বাড়ীতে থাকেন বড়-দিদি. আর থাকি আমি। বুদ্ধি হইয়া অবধিই বড়-দিদিকে দেখিতেছি; তোমরা মায়ের নিকট যে স্নেহ, আদর পাও, ভাইয়ের নিকট যে ভালবাসা পাও, ভগিনীর নিকট যে আনন্দ পাও, আমি এক বড়দিদির নিকট সে সমস্তই পাই। আমার এই ক্ষুদ্র সংসার বড়-দিদিদের। বড়-দিদির কথা ব্যতীত আর কোন কথা আমার নিকট বড় বলিয়া মনে হয় না। আমার বড়-দিদির কথা তোমরা শুনিবে?

বড়-দিদির মুখে গল্প শুনেছি, বিবাহের তিন মাস পরে তিনি বিধবা হন। তখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর; আমার তখন জন্ম হয় নাই। তাহার তিন বৎসর পরে আমি যখন মাতগর্ভে, তখন আমার পিতা স্বর্গে যান। তাহার পর আমার জন্মের এগার দিন পরে মাতাঠাকুরাণী পিতার নিকট চলিয়া যান। সংসারে ১৬ বৎসরের মেয়ের নিকট এগার দিনের ছেলেকে রাখিয়া মা চলিয়া গেলেন।

বাবার বড়বাজারে একটা ছোট কাপড়ের দোকান ছিল। কাপড়ের দোকানের আয় যাহা ছিল, তাহাতে আমাদের সংসারযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইত। বাবা কিছু টাকাও জমাইয়াছিলেন। চোর বাগানের বাড়ীখানিতে আমরা বাস করিতেছি; ইটালীতে আর একখানি বাড়ী আছে, তাহার ভাড়া মাসে ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়।

বাবার মৃত্যুর পরেই বড়-দিদির দেবর আসিয়া আমাদের বিষয়-কর্ম্মে ব্যবস্থা করিতে চান। কিন্তু বড়-দিদির বয়স তখন ১৬ বৎসর হইলে তিনি সেই অযাচিত অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, নিজেই চেষ্টা করিয়া দোকানখানি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। দোকানের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আর

ইটালীর বাড়ীর ভাড়া আমাদের দুইটি মানুষের এই সংসার যাত্রার পাথেয় ছিল। এ সকল কথা আমি দিদির মুখে শুনিয়াছি।

তাহার পর আমি এই এত বড় হইয়াছি, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়াছি, জন মলিংটন কোম্পানীর বাড়ীতে ৮০ টাকা বেতনে চাকুরী করি, এ সমস্তই বড়-দিদির কৃপায়।

আমার জীবন-কাহিনী বলিবার জন্য বসি নাই; আমার জীবনে এমন কিছু ঘটে নাই, যাহা বলিতে পারি। বড় দিদির জীবনের একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। বড়-দিদির মুখেই কথাটি শুনিয়াছিলাম। তিনি কেন যে সে কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা জানি না।

বড়দিদির বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন আমাদের পাশের বাড়ীতে কতকগুলি অফিসের বাবু একটা মেস খুলিয়াছিলেন। একে মেস, তাহাতে অল্প-বেতনভোগী অফিসের বাবুদের আড্ডা সুতরাং সেটিকে কি নামে অভিহিত করা যায় ভাবিয়া পাইতেছি না। বড়দিদি কিন্তু পাশের বাড়ীটার নাম রাখিয়াছিলেন "মুক্তিমণ্ডপ"।

মেসের বাবুদের জ্বালায় আমাদিগকে অতিষ্ঠ হতে হয়াছিল। আমি তখন ছেলেমানুষ। আমি আর কি বুঝি; আমি মনের আনন্দে ছাতে খেলা করিয়া বেড়াইতাম; দিদিকে কতদিন ছাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তিনি যাইতেন না। যখন অনেক দিন পরে তিনি ঐ মেসের বাড়ীর গল্প করিয়াছিলেন, তখন আমি সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কলিকাতায় বাড়ী, পুরুষ অভিভাবক নাই। বাড়ীতে দিদি আর আমি। দিদির বয়স তখন আঠারো বৎসর। দিদি যে পরমা সুন্দরী ছিলেন— তাহা না বলিলেও চলে। এ অবস্থায় পাশের বাড়ীর সেই মুক্তিমণ্ডপ আমাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

আমাদের একজন চাকর ছিল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ, আমার বাবার আমলের চাকর। সে আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় নাই। বাহিরের যাহা কিছু দরকার, সমস্তই রামকৃষ্ণ নির্ব্বাহ করিত। সে প্রত্যহ আমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইত, আমার সহস্র আবদার সে দিদির সহিত ভাগ করিয়া বহন করিত।

একদিন দিদি রামকৃষ্ণকে বলিলেন যে, আমাদের এই বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে। রামকৃষ্ণ ত কথা শুনিয়াই অবাক্। দিদির নিকট শুনিয়াছি, বুড়া

রামকৃষ্ণ এই প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। পৈত্রিক বাড়ী, কি দুঃখে ছাড়িব। দিদি রামকৃষ্ণকে তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার নিকট সেদিন প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিলেন, সেদিন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, দিদি কেন পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

মেসের বাড়ীতে তের চৌদ্দ জন বাবু থাকিতেন; সকলেই নানা অফিসে কাজ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিক বয়সের কেহই ছিলেন না। বোধ হয় মুক্তিমণ্ডপের আনন্দের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়াই একদল নব্য বাবু মেস করিয়াছিলেন।

পাশের বাড়ী; ইচ্ছা করি আর নাই করি, সে বাড়ীব লোকের গতিবিধি সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হইবেই হইবে। গৃহস্থের বাড়ী হইলেও কথা ছিল; অফিসের বাবুদিগের মেস, সন্ধ্যার পর যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়িত; অথবা হঠাৎ কেহ দেখিলে মনে করিত, যাত্রা বা থিয়েটারের আড্ডা। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঘরে-ঘরে আমোদ-আহলাদ, ছাতে জটলা লাগিয়াই থাকিত।

এতগুলি বাবুর মধ্যে একটি বাবুকে বেশ একটু সভ্য বলিয়া দিদির মনে হইত। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ঐ দলের মধ্যে ঐ বাবুটী একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। তিনি কোন আমোদ-আনন্দে যোগদান করিতেন না; মেসের অন্যান্য সকলে যখন নীচের ঘরে হল্লা জুড়িয়া দিত, বাবুটি তখন ধীরে ধীরে ছাতে আসিতেন এবং অতি বিষণ্ণবদনে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। দিদির মুখে শুনিয়াছি, তিনি কোন দিনও আমাদের বাড়ীর দিকেও চাহিতেন না।

[মায়ের নাম]

(যোগেন্দ্রবাবুর কথা)

তেরশ' পয়ত্রিশ সালের বৈশাখ মাস।

আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধুর একখানি অনুরোধ-পত্র নিয়ে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি যুবক আমার কাছে উপস্থিত হোলো। পত্রখানি পড়ে দেখলাম, বন্ধু এই যুবকটির একটা চাকরী ক'রে দেবার জন্য অনুরোধ

করেছেন। তিনি লিখেছেন, ছেলেটির নাম রমেশচন্দ্র দাস; মাহিষ্যের ছেলে; মেদিনীপুর বাঙ্গালা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেছে; ইংরাজী বাঙ্গালা বেশ কম্পোজ করতে পারে; হাতও খুব চলে। দেখে বোধ হোলো, ছেলেটি অতি সচ্চরিত্র ও বিনয়ী।

পত্রখানি পড়া শেষ করে রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আরও পড়াশুনা না ক'রে চাকরীর খোঁজে বেরিয়েছে কেন?

রমেশ বলল, আমার নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু, গেল বৈশাখ মাসে বাবা মারা যাওয়ায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ীতে তোমার আর কে আছেন?

রমেশ বলল, বিধবা মা, আর বিধবা নিঃসন্তান এক বড় দিদি আছেন; আর কেউ নেই।

বললাম, তোমরা ত তিনটী মানুষ, তার মধ্যে আবার দু'জন বিধবা। তোমাদের কি এমন কিছু নেই যাতে এই তিনটী মানুষের ছোট সংসার চলে।

রমেশ বলল, সামান্য যা কয়েক বিঘে জমি আছে, নিতান্ত অজন্মা না হ'লে তাতে কোন রকমে চ'লে যায়, কষ্ট হয় না। তা হ'লেও আমার কিছু উপার্জ্জন করা দরকার। মেদিনীপুরের প্রেসে কম্পোজের কাজ আমি শিখেছিলাম। মেদিনীপুর হরেন্দ্রবাবুর কাছেই ছিলাম; তিনিই তাঁর প্রেসে আমাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রেস ত বড় নয়, কাজকর্ম্মও তেমন বেশী নয়। তাই, তাঁর ওখানে কাজের সুবিধে হবে না ব'লে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার সঙ্গে অনেক প্রেসওয়ালার জানা-শোনা আছে; একটু দয়া করলেই আমার একটা কাজ হয়ে যেতে পারে।

আমি বললাম তুমি যদি অন্য কোন কাজ পাবার আশায় এখানে আসতে, তা হ'লে তোমাকে পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দিতাম। কাজকর্ম্ম এখন মেলে না; কিন্তু, তুমি প্রেসের কাজ জান; তোমার একটা কিছু ঠিক করে দিতে পারব এ আশা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু, তার জন্যে ত দু'-চারদিন অপেক্ষা করতে হবে, আমাকে সন্ধান করবার সময় দিতে হবে।

রমেশ বলল, সে ত হবেই।

আমি বললাম, তুমি এখানে কবে এসেছ?

রমেশ বলল, আজই এসে ষ্টেশন থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। এখানে আমার চেনা লোক কেউ নেই। কলকাতায় আমি এর আগে কখন আসি নি। রেলে একজন কলেজের ছেলের সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁকে বলতে, তিনিই আমাকে আপনার বাড়ীতে এনে দিয়ে গেলেন; তা না হ'লে এত বড় সহরে পথ চিনে আমি হয় ত আসতেই পারতাম না। আপনি কোথাও আমার থাকবার একটা স্থান ঠিক করে দেন। আমার কাছে ছ'টা টাকা আছে। তাই দিয়ে বাসাখরচ চালাতে চালাতে আপনার দয়ায় একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি না হয় এক বেলা উপবাসই করব। তাতে কি এই ছয় টাকায় দিনকয়েক চলবে না? এখানে নাকি খরচ খুব বেশী লাগে, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। বাড়ী থেকে আর টাকা আনতে পারব না; তা হ'লে মা আর দিদির কষ্ট হবে।

রমেশ যখন এই কথাগুলো বলছিল, আমি তখন তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, ছেলেটা সত্যসত্যই সুবোধ ও বিনয়ী। তার কথা শুনে পামার বড়ই তৃপ্তি বোধ হ'ল। আমি বললাম, দেখ রমেশ, যে ক'দিন তোমার কাজকর্ম্ম না হয়, সে ক'দিন আমার এখানে থাকতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

রমেশ একটু চুপ ক'রে থেকে হাতযোড় ক'রে বলল, সে কি ক'রে হবে? শুনেছি, এখানে খরচ বড় বড় বেশী। আমার জন্য আপনি এত করবেন কেন? সে হয় না। আপনি দয়া ক'রে আমার একটা কাজ ঠিক ক'রে দেবেন, এই ঋণই যে আমি শোধ করতে পারব না। আপনি একটা যে কোন স্থান ঠিক ক'রে দেন। আমার ছ'টা টাকাতে যদি না কুলোয়, তখন না হয় আপনার কাছে কিছু ধার নেব, কাজ হলে শোধ করব।

আমি বললাম, সে কথা পরে হবে। আমি ত তোমাকে স্থায়ীভাবে এখানে থাকতে বলছি নে যে, তুমি কুণ্ঠা বোধ করছ। যে ক'দিন কাজ না পাচ্ছ, সেই ক'দিন আমার এখানে থাক; কাজ ঠিক হয়ে গেলে একটা বাসা খুঁজে নিও, আমি তখন আপত্তি করব না।

রমেশ তার সঙ্কোচের ভাব দূর করতে পারছিল না; কি যে বলবে, তাও ঠিক করতে পারছিল না; শুধু বললে—তা, তা, সে কি ক'রে হবে।

আমি বললাম সে যা ক'রে হয়, তা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ভাবছ, তোমার দু-বেলা দুটো খেতে দিতে আমার অতিরিক্ত খরচ

হবে, কেমন? তুমি ছেলেমানুষ, ঘরগৃহস্থালী ত কর নি। পনের জনের সঙ্গে অতিরিক্ত দু-একজন যোগ দিলে গৃহস্থের খরচ বাড়ে না, ওইতেই চলে যায়। তুমি আপত্তি করো না, আমার এখানেই দিনকয়েক থাক। আমিও গরিব মানুষ, তুমিও গরিবের ছেলে; আমার সামান্য শাকভাতে তোমার কষ্ট হবে না, তাই ভেবেই তোমাকে অনুরোধ করতে সাহস করেছি।

কি যে আপনি বলেন, ব'লে রমেশ আমার পায়ের ধূলা নিতে এল; আমি তার হাত চেপে ধরে বললাম, প্রণাম করতে হবে না, অমনিই আশির্ব্বাদ করছি, দীর্ঘজীবন লাভ করো, ধর্ম্মে মতি হোক।

[উৎস]

ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীতের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সামান্য ব্যাপার হইতে কেমন করিয়া বড় ব্যাপার হইয়া থাকে, ইহা তাহারই ইতিহাস।

একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভাড়া বাড়ীতে (কুমারখালি) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি, এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুলমাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় আমোদ আহলাদে কাটাইয়া দিই।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, 'গ্রামবার্ত্তার 'কপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত পা ছড়াইয়া, বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার অফিস, অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান অক্ষয়কুমার, গ্রামবার্ত্তার প্রিন্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালী বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য, সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমা'দর কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে

লাগিল, কিন্তু কর্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, 'একটা বাউলের দল করিলে হয় না?" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সে দিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙ্গালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। লালন ফকির কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী কালীগঙ্গার তীরে বাস করিতেন। তাহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা বলা বড় কঠিন, কারণ তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্ম্মকথাও বলিতেন না। তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল---তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিয়াছি, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠীরে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মনমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিযাছিল; ইহার মধ্যে কেহ স্থানত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই লালন ফকির কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটি গান করিয়াছিলেন। সব কয়টি গান আমার মনে নাই; একটি গান মনে আছে। যথা—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে;
আমার ঘরের কাছে আরসী-নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে।...

প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন, আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম; কিন্তু আমরা যে সে গানের মর্ম্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারিনা। দ্বিপ্রহরের সেই রৌদ্রে শ্রীমান অক্ষয়ের মনে হয়ত হঠাৎ লালন ফকিরের গানের কথা উদিত হইয়াছিল; তাই সে বলিয়া বসিল 'একটা বাউলের দল করিলে হয় না? সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ বেশ।"

"বেশ বেশ" বলাটা খুব সহজ; কিন্তু গান কোথায়? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই; কচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল গান কাহার ও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন 'নূতন করিয়া গান

প্রস্তুত করিতে হইবে।” শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার না পারেন এমন কথাই নাই। তখনও তিনি যেমন ছিলেন এখনও তাই; বয়সের পরিণতিতে সে ভাবটা এখনও যায় নাই; তিনি যাহা ধরেন তাহাই করিতে পারেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন ‘তার জন্য ভয় কি? ধরত জলদা, কাগজ; বাউলের গানই লেখা যাক।” আমি তখন কাগজ কলম লইয়া বসিলাম। গ্রামবার্ত্তার কাপি লিখিবার জন্য যে কাগজ গোছাইয়া বসিয়াছিলাম, তাহারই শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। অক্ষয়কুমার বলিলেন—

“ভাব মন দিবানিশি, অভিনাশি,
সত্য-পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে,
ছোঁবে না রে সোনা দানা;
সেই পথে মনোসাধে চল রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারে বাঁকা পথে দিনে রেতে,
চোব ডাকাতে দেয় বাতনা;
আবার রে ছয়টা চোরে ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে সব সব সাধনা।”

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলেই অক্ষয় বলিলেন ‘‘এত দূর ত হোলো— তার পর?” তারপর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন ‘,কথাটা বুঝিলে না। বাউলের গানের নিয়ম হচ্ছে এই যে, গানের শেষে একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?” অক্ষয় বলিলেন ’সেই কথাই ত ভাবছি।” তখন এক এক জন এক একটা নাম বলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনটাই ‘ভোটে’ টিঁকিল না। আমি বলিলুম “অত গোলে কাজ কি। গানটা নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক করে দেবেন।” অক্ষয় বলিলেন ‘তা হবে না; তাঁকে একেবারে Surprise (অবাক) কোরতে হবে। রও না, আমিই একটা নূতন নাম ঠিক কোরছি।” এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন “লেখ জলদা।” আমি কলম ধরিলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা বলিলেন—

“ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই,
মিছামিছি পর ভাবনা;

চল যাই সত্য পথে কোন মতে

এ যাতনা আর রবে না।"

বাস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন 'ফিকিরচাঁদ' নামটা ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না। কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। 'ফিকিরচাঁদ' নামের ইহাই ইতিহাস।

গানটা হইয়া গেল, তখন আমাদের মধ্যে পাকা ওস্তাদ প্রফুল্লচন্দ্র গানের সুর দিলেন। সুরটা নূতন কি পুরাতন তাহা আমি বলিতে পারির না। কিন্তু পুরাতন হইলেও ঐ সুর বড়ই বাজিয়া উঠিল; পরে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ঐ সুরে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহার্সেল দেওয়া শেষ হইল তখন স্থির হইল গানটা একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কি, তোদের আবার তর্ক বেধেছে না কি'। তোদের জ্বালায় দেখ্‌ছি একটু স্থির হ'য়ে কাজ করবারও যো নেই। কি ব্যাপার বল ত?" তখন শ্রীমান অক্ষয় আমাদের মুখপাত্র স্বরূপ (কারণ তিনি তখন বি, এল পড়েন—লায়েক হইয়াছেন) বলিলেন "আমরা একটা বাউলের দল কোরবো। তার জন্য একটা গান লিখিছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল সাত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখিচিস? সুর বসানো হোয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হোয়েছে; এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ বেশ; সকলে মিলে গা দেখি।"

আমরা সকলে গান ধরিলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন; তাহার পর যখন অন্তরা ধরা হইল তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান। সে এক অপার্থিব দৃশ্য।

শেষে গান থামিয়া গেলে কাঙ্গাল বলিলেন "দেখ, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা' একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না। আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ কলম ধর ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন; তাহার পর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিয়া লইতে লাগিল। তিনি গাইলেন—

আমি কোরব এ রাখালী কতকাল।
পালের ছুটা গরু ছুটে,
কোরছে আমায় হালবেহাল।...

এইটী দ্বিতীয় গান। এই দুইটি গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময় গ্রামে বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখেল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রাম বার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল।

"ভাব মন দিবানিশি—"

তখন সেই গান শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে ধন্য ধন্য করিল, বৃদ্ধেরা অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাহারা পরদিন হইতে পথে ঘাটে আর কোন কথা নাই, শুধু

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।"

দুইটি গান লইয়া বাউলের দল প্রথমে গ্রামে বাহির হইল: কিন্তু দুইটি গানে লোকের পিপাসা মিটিল না; দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই কুমারখালী গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী কুড়ি পচিশ খানি গ্রামের আবালবৃদ্ধ গান দুইটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। আমরা যখন যেখানে যাইতাম, শুধু শুনিতাম কেহ গাহিতেছে—

"ভাব মন দিবানিশি—"

অথবা আর কেহ গাহিতেছে—

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।'

(কাঙ্গাল হরিনাথ: ১ম খণ্ড)

সেই সময়ে কয়েক দিনের জন্যে আমার পিস্তুতো ভাই বঙ্কুবিহারী বাড়ী এসেছিলেন। মা ও জেঠাইমা তাঁকে ধরে' বসলেন যে, আমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দুটো পরীক্ষা করাতে

হবে। আমার পিস্‌তুতো ভাই কি করেন, বাড়ীর সকলের কাতর অনুরোধে তিনি আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে স্বীকার করলেন। চোখের চিকিৎসা হউক, অন্ধত্ব ঘুচুক, রেল চড়া হবে, কলির সহর কলকাতা দেখা হবে, এই আনন্দ আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। কোনদিন বাড়ী ছাড়া হইনি, দূরদেশে যেতে হবে, সেখানে মা-বোন কেউ নেই, হয়ত কত কষ্ট হবে— এসব কিছুই আমার মনে হ'ল না। আমি কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। শুভ দিনে আমার সেই পিস্‌তুতো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে' এলুম। সেটা কোন সাল, তা' আমি পুঁথিপত্র না দেখে মুখে-মুখেই বলতে পারচি নে। যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা সালটা ঠিক ক'রে নেবেন, কারণ সেই সালেই হাইকোর্টের বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবকে আবদুল্লা নামে এক পাঠান টাউন-হলের সিঁড়ির মধ্যে খুন করে। তখন নূতন হাইকোর্ট বাড়ী হয় নি, টাউনহলেই হাইকোর্ট বসত। আর তার অব্যবহিত পরে ভারতের বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান দ্বীপে একজন দায়মালী বন্দী সিয়ার আলির হাতে নিহত হন। আর এইটুকু মনে আছে, সেদিনটা সরস্বতী পূজার আগের দিন। কারণ সরস্বতী পূজার দিন জোড়াসাঁকো শ্যাম মল্লিকের বাড়ী আমার পিসতুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক গানবাজনা আমোদপ্রমোদ হ'বে ব'লে দাদা সন্ধ্যার সময়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্যাম মল্লিকের বাড়ী গিয়ে দেখি সব নিস্তব্ধ, পূজাপ্রাঙ্গণে অল্প কয়েকটি আলো জলছে। তখন জানতে পারা গেল, আন্দামানে বড়লাট সাহেব খুন হয়েছেন, তাইতে সহরের সরস্বতী পূজা'র আমোদ, আনন্দ, সমারোহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি ছেলেমানুষ, সবে কলকাতায় এসেছি, সানপুকুরের বিখ্যাত বাগানের মালিক শ্যাম মল্লিকের বাড়ী কত নাচ গান দেখব শুনব, সে সব কিছুই হ'ল না সেই নৈরাশ্যের কথাটা এই বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত আমার মনে আছে।

তখনকার কলকাতার কথাও একটু বলি। তখন গঙ্গার ধারে রাস্তা হয়নি, হাবড়ার পোল তখন তৈরী হচ্ছে। সহরের অলিগলিতে তখন শিয়াল ডাকত। মিউনিসিপ্যালিটির এমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী আর পাল্কী ছাড়া যানবাহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। জলের কল তখন সবে হয়েছে, কি হব-হব হয়েছে, ঠিক আমার মনে নেই। ব্রাহ্মসমাজের কেশব সেন অগ্র-পশ্চাৎ সেই সময়েই বোধহয় বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন।

মেছোবাজারে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হয়েছে। একথাটি বলচি এই জন্য যে, আমার সেই পিসতুতো ভাই কেশব সেনের চেলা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে যেতাম। কেশব-বাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরবাবু, গৌরগোবিন্দবাবু আরও বড় বড় ব্রাহ্ম আমাকে ভালবাসতেন। দাদার সঙ্গে আমি আদি ব্রাহ্ম-সমাজেও গিয়েছি। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও গায়ক বিষ্ণুবাবুর সম্মুখে আমি পড়েছিলুম। দাদা আমাকে তাঁর ছোট ভাই বলে' পরিচয় করে' দিলে, আমি তাঁদের দু'জনকেই প্রণাম করেছিলুম। মহর্ষি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে আশীর্ব্বাদের কথা আমি এখনও ভুলিনি।

সে কথা থাক, যে জন্য কলকাতায় এসেছিলুম, সেই কথাটাই বলেনি।

সেটা আমার চোখের চিকিৎসার কথা। চোরবাগানের পরলোকগত লালমাধব মুখোপাধ্যায় সে সময়ে কলকাতায় একজন বেশ বড় চিকিৎসক ছিলেন। চক্ষুরোগের চিকিৎসায় তাঁর বেশ সুযশ ছিল। প্রথম মাসখানেক তিনিই চিকিৎসা করলেন। কোনই সুফল হ'ল না। আমি যেমন অন্ধ তেমনই থাকলাম। তখন কলিকাতায় চক্ষুরোগের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক ছিলেন Dr. Macnamara। শুনতে পাই তাঁর মত চক্ষুরোগের চিকিৎসক ভারতবর্ষে আর কখনও আসে নি। লালমাধববাবুর চিকিৎসার যখন কোন ফল হ'ল না, তখন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে Dr Macnamaraকে দেখানই স্থির হল। কলেজে Outdoor রোগী হয়ে দেখালে, চিকিৎসকেরা কোন রকমে ব্যাগার শোধ দেন, বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সেইজন্য একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে মুরব্বি স্থির করার ব্যবস্থা হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে আমার দাদার সঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পরলোকগত দুর্গাদাস কর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দুর্গাদাসবাবু সমস্ত অবস্থা শুনে, নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে Macnamara সাহেবের বাড়ীতে গেলেন। আমার অবস্থার কথা শুনে সাহেবের দয়ার সঞ্চার হ'ল। তিনি নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে আমার চক্ষু পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, চোখে অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে ফল হবে না। আবার তেননি পর্দ্দা বেড়ে চোখের ক্ষেত্র ঢেকে ফেলবে। তিনি তখন ঔষধ প্রয়োগেরই ব্যবস্থা করলেন এবং প্রতি সপ্তাহে রবিবারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। আমি গরীব ব'লে তিনি যে ছ'মাস আমার চিকিৎসা করেছিলেন, ছ'মাসই প্রতি রবিবারে পরীক্ষা

করার জন্যে কোন পারিশ্রমিক ত নেনই নি, ওষুধের দাম পর্যন্ত নেননি। ছ-মাস চিকিৎসা করে'ও যখন কিছু হ'ল না তখন তিনি বললেন—ওষুধে বা অস্ত্র করে কিছু হবে না, বয়স একটু বাড়লে আপনিই সেরে যাবে। অত বড় চিকিৎসকের কথায়ও কিন্তু দাদা আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল।

তখনও হোমিওপ্যাথিক তত পসার হয় নি। তা' না হলেও, সে সময়ে কলকাতায় যিনি প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, তাঁর পসার-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁর নাম ডাক্তার বেরেনি। বেরেনি সাহেবের ডাক্তারখানা তখন লালবাজারের মোড়ের উপর ছিল। তখনও ছিল, এই অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ছিল। সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে বেরেনি সাহেবকে চোখ দেখান হ'ল, তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সে এক কৌতুক-জনক ব্যাপার। এখন ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেখি, ব্যবহারের তেমন কড়াকড়ি নেই, পথ্যেরও তেমন কঠোর বিধান নাই। কিন্তু তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুচিবায়গ্রস্ত ছিল। সপ্তাহান্তে একদিন করে, সাহেবের ডাক্তারখানায় যেতে হ'ত। তিনি তাঁর বাক্স খুলে অতি সন্তর্পণে ছোট একটি শিশি বার করে', তারই এক ফোঁটা, চার আউন্স একটা শিশিতে সমস্তটা জল ভরে' তাতে ফেলে দিতেন। তারপর ১০/১৫ মিনিট সেই শিশিটা নেড়ে চেড়ে, সেই জলের কাঁচচা পরিমাণ ছোট একটা কাচের গ্লাসে ঢেলে আমাকে খাইয়ে দিতেন। বাস—এই সাত দিনের ওষুধ। সাতদিনের মধ্যে আর কোন ওষুধ খেতে হ'ত না। তারপর পথ্যের কথা। নুন, লঙ্কা একেবারে বাদ। মশলার মধ্যে একটু জিরে বাটা। তরকারী একেবারে বন্ধ। মাছ খেতে দিতে আপত্তি নেই; কিন্তু খেতে হবে মাছ সিদ্ধ করে' একটু জিরে বাটা মেখে। মিষ্টি জিনিষের মধ্যে খুব বেশী হলে সারাদিনে এক ছটাক মিছরি, তা'ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং মোটের ওপর পথ্য দাঁড়ালো, এক বেলা দুধ-ভাত, ছোট একটুকরো মিছরি, আর এক বেলা দুধ-সাগু। অন্য সময়ে ক্ষিদে পেলে একটু দুধ। এই কঠোর নিয়মে পথ্য করে' ছ'মাসেও চোখের অসুখ সারলো না বটে, কিন্তু আহার-সংযম অভ্যাস হয়ে গেল। সে সংযম এখন পর্য্যন্ত আমার আছে।

(জলধর সেনের আত্মজীবনী)

কিছুদিন পরে সীতাদেবী দুই যমজ কুমার প্রসব করিলেন। তপোবন-বাসীদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না; সেই তপোবনে সীতার শুশ্রূষার জন্য যাহা করা সম্ভবপর, তাহার ত্রুটী হইল না। মহর্ষি বাল্মীকি যথারীতি জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান শেষ করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। বনবাসিনী সীতাদেবী কুমার-যুগলের বদন দর্শন করিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। এক্ষণে তিনি আর একটী কাজ প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন কেবল রামচন্দ্রের ধ্যানেই কালযাপন করিতেন, এক্ষণে রামচন্দ্রের তনয়দ্বয়ের লালন-পালনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি পুত্রদ্বয়কে পরম যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লবের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ঋষিকুমারগণ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তাহাই শিক্ষা দিলে এই বালকদ্বয়ের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। তাহারা ত আর ঋষিবালক নহে; ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি তাহাদের ভবিষ্যৎও জানিতেন; সুতরাং বালকদ্বয়কে ক্ষত্রিয়ের কুমারগণের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করাই মহর্ষি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। একে বালকদ্বয় মেধাবী, তাহার পর জননীর উপদেশে তাহারা চলিত; তাহার পর এমন একজন ঋষি তাহাদিগের শিক্ষক; সুতরাং বালকদ্বয়ের শিক্ষাকার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত মহর্ষি বাল্মীকির শান্তির সম্পদ তপোবনের বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক মহর্ষি কখন বালকদ্বয়কে নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন; কখনও বা বনের মধ্যে লইয়া গিয়া ধনুর্ব্বাণ ও নানা অস্ত্র-ব্যবহার শিক্ষা দিতেন। মহর্ষি ইচ্ছা করিয়াই বালক-দ্বয়কে আর একটা বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন; তিনি স্বয়ং সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; কুশ ও লবকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন হইতে রামচরিত লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন; কুশ ও লব যখন তাঁহার নিকট শিক্ষা-গ্রহণের উপযুক্ত হইল, তখন তাঁহার রামায়ণ রচনা শেষ হইয়াছে, তিনি কুশ ও লবকে সেই রামায়ণ গান করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকদ্বয় যখন বীণাযন্ত্রসহকারে মহর্ষি-রচিত রামচরিত গান করিত, তখন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া সেই তানলয়বিশুদ্ধ গাথা শ্রবণ করিত। বালকদ্বয় জানিত না যে, তাহারা তাহাদেরই পরম পূজনীয় পিতৃদেবের জীবনচরিত গান করিতেছে; তাহারা জানিত সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের

ন্যায় নরপতি পৃথিবীতে আর নাই; সেই রামচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। আর সীতাদেবী,— তিনি যখন পুত্রদ্বয়ের মুখে রাম-চরিত শ্রবণ করিতেন, তখন তাঁহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, তিনি একমনে পুত্রের মুখে পিতার পবিত্র চরিত-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এইরূপে বালকদ্বয় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহর্ষি এই শিক্ষা প্রদান করিয়াও নিশ্চিত হইলেন না; যে বালকেরা ভবিষ্যতে অযোধ্যার অধিপতি হইবে, এখন হইতেই তাহাদিগের রাজ্য-শাসন প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজন। মহর্ষির তপোবনে অন্য সকল শিক্ষাই হইতে পারে, কিন্তু রাজ্যশাসন শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে? তখন কি উপায়ে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা পুনরায় গৃহীতা হন, মহর্ষি সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

(সীতাদেবী)

তথ্য-সংকেত

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: আবুল আহসান চৌধুরী: 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার'। বাংলা একাডেমী—ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮; পৃ: ৯—১৩।
২. জলধর সেনের জন্মকালে কুমারখালী পাবনা জেলার অন্তর্গত ছিলো, পরে ১৮৭১ সালে নদীয়া জেলাভুক্ত হয়।
৩. জলধর সেনের পৌত্র অধ্যাপক কাজল সেনের (অনুপকুমার সেন) সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৪. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। লিপিকার: নরেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬৩; পৃ: ২।
৫. ঐ; পৃ: ১৩।
৬. "ভারতবর্ষ": চৈত্র ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৫৩৯।
৭. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৩১—৩২।
৮. ঐ; পৃ: ৩২।
৯. ঐ; পৃ: ১৫—১৬।
১০. ঐ: পৃ: ১৪—১৫।
১১. ঐ; পৃ: ২২।
১২. ঐ; পৃ: ৫৯।
১৩. 'ভারতবর্ষ': কার্তিক ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৭১২।
১৪. 'ভারতবর্ষ': অগ্রহায়ণ ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৯৩১-৩২।
১৫. ঐ; পৃ: ৯৩৩।
১৬. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৫৭—৫৮।

১৭. ঐ; পৃঃ ৮০।

১৮. জলধর সেনের প্রথম বিবাহের এই সাল-তারিখের তথ্য জানিয়েছেন তাঁর পৌত্র অধ্যাপক কাজল সেন (আবুল আহসান চৌধুরীকে লিখিত পত্র: ১৮. ৭. ১৯৮৯)। কিন্তু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত জলধরের প্রথম বিবাহের সাল উল্লেখ করছেন ১৮৮৩ (দ্র. 'জলধর-কথা': ব্রজমোহন দাশ সম্পাদিত; কলিকাতা ১৩৪১; পৃঃ ১৭৭)। অন্যত্রও বিবাহের সাল হিসেবে ১৮৮৩ সমর্থিত হয়েছে ('জলধর সেনের আত্মজীবনী': পরিশিষ্ট; পৃঃ ১৩৭)।

১৯. কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (মোহিত রায় সম্পাদিত): 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত'। কলিকাতা, মঞ্জুষা সংস্করণ ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬; পৃঃ ৬৩-৬৭।

২০. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃঃ ৭২।

২১. ঐ, পৃঃ ৭৫—৭৬।

২২. ঐ; পৃ ৭২।

২৩. দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'সেকালের স্মৃতি'। কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯৫; পৃঃ ৮৯।

২৪. ঐ; পৃঃ ১০০।

২৫. এই সাল অধ্যাপক কাজল সেনের তথ্য থেকে গৃহীত। দীনেন্দ্রকুমার উল্লেখ করেছেন ১৮৯৩ (পূর্বোক্ত; পৃঃ ১০১)।

২৬. দীনেন্দ্রকুমার রায়: পূর্বোক্ত; পৃ: ৯৭।

২৭. ঐ; পৃঃ ১০১।

২৮. 'লোকসাহিত্য পত্রিকা': জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৮৪। এম. আশরাফ-উল হক: "নজরুলের একটি কবিতার জন্মকথা"। পৃঃ ৮০—৮১।

২৯. 'ভারতবর্ষ': চৈত্র ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃঃ ৫৪১।

৩৯. 'বসুমতী': শ্রাবণ ১৩৪৩। দীনেন্দ্রকুমার রায়: "জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা" (২য় প্রস্তাব)। পৃঃ ৫৬৫। [কৃষ্ণনগরের শ্রী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]।

৩১. 'ভারতবর্ষ': ফাল্গুন ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃঃ ৩৪৪।

৩২. ঐ; পৃঃ ৩৪৬।

৩৩. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ১৮।
৩৪. 'ভারতবর্ষ': ফাল্গুন ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ" পৃ: ৩৪৩।
৩৫. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৬৪।
৩৬. ঐ; পৃ: ৭৩।
৩৭. ঐ; পৃ: ৭৪।
৩৮. 'ভারতবর্ষ': ফাল্গুন ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ" পৃ: ৩৪৪।
৩৯. দীনেন্দ্রকুমার রায়: সেকালের স্মৃতি'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৯১।
৪০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: 'কল্লোল যুগ'। কলিকাতা, পঞ্চম প্রকাশ-বৈশাখ ১৩৭২; পৃ: ২১৯।
৪১. 'ভারতবর্ষ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। প্রমথ চৌধুরী: "জলধর-স্মৃতি"। পৃ: ৯৭৫।
৪২. ব্রজমোহন দাশ সম্পাদিত: 'জলধর-কথা'। সরলা দেবী: "জলধর সেন"। কলিকাতা, ১৩৪১; পৃ ৪।
৪৩. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। সরোজকুমার রায়চৌধুরী: "সুস্নিগ্ধ জলধর"। পৃ: ৯৬৪।
৪৪. 'ভারতবর্ষ': ঐ। প্রফুল্লকুমার সরকার: "জলধর-স্মৃতি"। পৃ: ৯৬৯-৭০।
৪৫. সাগরময় ঘোষ: সম্পাদকের বৈঠকে'। কলিকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ-কার্তিক ১৩৮৩; পৃ: ৮—১৩।
৪৬. 'বসুমতী': শ্রাবণ ১৩৪৩। জলধর সেন: "আমার স্মৃতি-তর্পণ"। সম্বন্ধে দু'একটি কথা"। পৃ: ৭২২।
৩৭. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: "জলধর-প্রশস্তি"। পৃ: ৮৩-৮৪।
৪৮. 'ভারতবর্ষ': কার্তিক ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৭১২।
৪৯. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৬২।
৫০. ঐ; পৃ: ৫৩
৫১. সাগরময় ঘোষ: পূর্বোক্ত। পৃ: ৪।

৫২. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত। প্রবোধকুমার সান্যাল: "জলধর সেন"। পৃ: ৪৪।

৫৩. 'সাগরময় ঘোষ: পূর্বোক্ত। পৃ: ৯৪।

৫৪. ঐ: পৃ: ৯৫।

৫৫. 'ভারতবর্ষ': আষাঢ় ১৩২১। দীনেন্দ্রকুমার রায়: "অক্ষয় তৃতীয়ার 'আতিথ্য'।" পৃ: ১১৩।

৫৬. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: পরিশিষ্ট-১৫৩।

৫৭. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ: "জলধর"। পৃ: ৯৭৪।

৫৮. সাগরময় ঘোষ: পূর্বোক্ত। পৃ: ৫।

৫৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: পূর্বোক্ত। পৃ: ২১৯—২০।

৬০. 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি': বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৯৬। কাজল সেন: "জলধরে রবিচ্ছটা"। পৃ: ১৪—২৪। [রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সনৎকুমার মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত]।

৬১. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬: প্রফুল্লকুমার সরকার: "জলধর-স্মৃতি"। পৃঃ ৯৭০।

৬২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: পূর্বোক্ত: পৃ: ২১৯।

৬৩. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: "নমস্কারী"। পৃ: ৯৫৬।

৬৪. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: "খাঁটী-বাঙ্গালী"। পৃ: ৩৬—৩৮।

৬৫. 'ভারতবর্ষ': আশ্বিন ১৩৪১। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ: "সাহিত্যিক-সম্বর্দ্ধনা"; পৃ: ৬৩৪—৩৫। [ডক্টর অরুণা চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]।

৬৬. 'ভারতবর্ষ': বৈশাখ ১৩৪৬। পৃ: ৮২০।

৬৭. 'ভাবতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। রাজশেখর বসু: "স্বর্গত রায়বাহাদুর জলধর সেন"। পৃ: ৯৬০।

৬৮. 'প্রবাসী': জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯। পৃ: ২৬৮। [ডক্টর সুকুমার বিশ্বাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]।

৬৯. কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট (১৯৪৭—৪৮) সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০৩—১৯৮১) তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন: "জলধর সেন

কুমারখালিতে 'হিমালয়' নামীয় একটি ক্ষুদ্র দালান পান্থশালারূপে ব্যবহারের নিমিত্ত দান করেছিলেন। আমি এক রাত্রি পান্থশালাতে কাটাই। এই পান্থশালার সামনে ছিল বিস্তৃত প্রান্তর ও জলাভূমি। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মোহনীয়।" ('আমাদের কালের কথা': দ্বি-স, চট্টগ্রাম-পৌষ ১৩৮২; পৃ ২৭০)। পঞ্চাশের দশকে গড়াই নদীর প্রবল ভাঙনে জলধর সেনের এই 'হিমালয়' গৃহটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

৭০. 'ভারতবর্ষ': বৈশাখ ১৩৪৬। পৃঃ ৮১৮।
৭১. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ১৫।
৭২. ঐ; পৃঃ ১৫।
৭৩. ঐ; পৃঃ ১০৩।
৭৪. দীনেন্দ্রকুমার রায় ঃ 'সেকালের স্মৃতি'। পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৯১।
৭৫. ঐ; পৃঃ ৯৩
৭৬. 'ভারতী' ঃ বৈশাখ ১৩২৩। জলধর সেন: "ভারতী-স্মৃতি"।
৭৭. দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'সেকালের স্মৃতি'। পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৯৪।
৭৮. 'ভারতী': বৈশাখ ১৩২৩। জলধর সেন ঃ "ভারতী-স্মৃতি"।
৭৯. 'ভারতবর্ষ' ঃ পৌষ ১৩৪২। জলধর সেন ঃ "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃঃ ৪৪।
৮০. জলধর সেন: 'মধ্যভারত'. পৃঃ ৭৩। কাজল সেনের প্রবন্ধ, 'জলধরে রবিচ্ছটা'য় উদ্ধৃত ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি' : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৬; পৃঃ ২০)।
৮১. নারায়ণ চৌধুরী ঃ 'বরণীয় লেখক সৃষ্টি'। কলিকাতা, পৃঃ ১০৯।
৮২. 'ভারতবর্ষ' ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। প্রফুল্লকুমার সরকার ঃ "জলধর-স্মৃতি"। পৃঃ ৯৬৯।
৮৩. 'জলধর-কথা'। হেমেন্দ্রকুমার রায় ঃ "জলধর-পূজায় যৎকিঞ্চিৎ"। পৃঃ ২২।
৮৪. ঐ। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী: "প্রকৃতি পুরুষ যযোন:"। পৃঃ ৬।
৮৫. ঐ। জ্যোৎস্নানাথ চন্দ্র: "জলধর প্রসঙ্গ"। পৃঃ ১৩৩।
৮৬. ঐ। অবনীনাথ রায়: "জলধর সেন"। পৃঃ ১১০।
৮৭. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬: প্রফুল্লকুমার সরকার: "জলধর-স্মৃতি পৃঃ ৯৭০।

৮৮. ভূদেব চৌধুরী: 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'। কলিকাতা, ১৯৬২; পৃ: ২৭৪।

৮৯. 'জলধর-কথা: পূর্বোক্ত। পৃ: ২০৮।

৯০. সুকুমার সেন: 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)। বর্দ্ধমান, ১৩৬৫; পৃ: ৫৫।

৯১. 'জলধর-কথা: পূর্বোক্ত। সুকুমাররঞ্জন দাশ: "জলধর-প্রশস্তি। পৃ: ৫০।

৯২. সুকুমার সেন: পূর্বোক্ত। পৃ: ৫৫।

৯৩. 'জলধর-কথা: পূর্বোক্ত। পৃ: ২০৫।

৯৪. 'জলধর-গ্রন্থাবলী: (২য় খণ্ড)। কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২; পরিশিষ্ট-পৃ: ৮।

৯৫. 'জলধর-কথা: পূর্বোক্ত। বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ: হিমালয়ের আড়ালে। পৃ: ১৫৬।

৯৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র: 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য'। কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮; পৃ: ২৮।

৯৭. জলধরের চিঠি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের কনিষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার জনাব এম. আশরাফ-উল হকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৯৮. 'ভারতবর্ষ': বৈশাখ ১৩৪৬। পৃ: ৮২০।

৯৯. জলধর সেনের গ্রন্থ-বিবরণী প্রস্তুত করেছি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা), নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (জলধর-কথা) ও অধ্যাপক কাজল সেনের তথ্য থেকে। বিভিন্ন গন্থাগারে রক্ষিত জলধরের বই থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর সাধারণ সম্পাদক জন-ইতিহাসের প্রাজ্ঞ গ'বেষক শ্রীমোহিত রায় ও বিশিষ্ট গবেষক শ্রী অশোক উপাধ্যায় (দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১০০. সুকুমার সেন 'নৈবেদ্য'কে দ্বিতীয় এবং 'ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প'কে জলধরের প্রথম গল্পসংগ্রহ বলে যে তথ্য দিয়েছেন ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড: বর্দ্ধমান ১৩৬৫; পৃ: ৫৪) তা সঠিক নয়।

১০১. আবুল আহসান চৌধুরী: 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৪৯।

১০২. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত পৃ: ১০৩—০৪।

১০৩. ঐ; পৃ: ১১৫—১৬।

১০৪. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ: "জলধর"। পৃ: ৯৭২।

১০৫. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃঃ ৯১০।

১০৬. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পরিশিষ্টে সংকলিত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধ "জলধর সেন"। পৃ: ১৪৯—৫০

১০৭. 'ভারতবর্ষ': আষাঢ় ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ১২৪-২৫।

১০৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'জলধর সেন'। "সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা। দ্বি-স: কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৬৬। পৃ: ৪৯।

১০৯. 'ভারতবর্ষ': শ্রাবণ ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃঃ ২৩৭।

১১০. 'ভারতবর্ষ': শ্রাবণ। ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃঃ ২৩৯।

১১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত। পৃ: ৫২:

১১২. 'ভারতবর্ষ': ভাদ্র ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৪১৩

১১৩. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ: "জলধর"। পৃ: ৯৭৩।

১১৪. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পরিশিষ্টে সংকলিত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধ "জলধর সেন"। পৃঃ ১৫২।

১১৫. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: "নমস্কারী"। পৃ: ৯৫৬।

১১৬. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। প্রমথ চৌধুরী: "জলধর-স্মৃতি"। প: ৯৭৫।

১১৭. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৮,১৫।

১১৮. ঐ; পৃ: ৯।

১১৯. ঐ; পৃ: ৯।

১২০. ঐ; পৃ: ১০১।

১২১. ঐ; পৃ: ৮৯।

১২২. দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'সেকালের স্মৃতি'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৯২।

১২৩. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত। খগেন্দ্রনাথ মিত্র: 'প্রীতি নিবেদন'। পৃ: ৫৯—৬০।

১২৪. 'সাহিত্য': বৈশাখ ১৩০৩। জলধর সেন: "গঙ্গোত্রীর পথে"। পৃ: ৪৪—৪৫।

১২৫. 'দাসী': জুন ১৮৯৬। জলধর সেন: "হরিনাথ মজুমদার"। পৃ: ৩১৪।

১২৬. 'মানসী": আষাঢ় ১৩২১। দীনেন্দ্রকুমার রায়: "বঙ্গ-সাহিত্যে হরিনাথ"। পৃ: ৬৫৯।

১২৭. ৪২ সংখ্যক পত্র। কাঙাল হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত মথুরানাথ যন্ত্রের পত্র-নকল খাতা: ১৩০৭ বাং। [আবুল আহসান চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ]।

১২৮. 'ভারতবর্ষ': চৈত্র ১৩৪২। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৫৪১।

১২৯. 'দাসী': জুন ১৮৯৬। জলধর সেন: "হরিনাথ মজুমদার"। পৃ: ৩০৬।

১৩০. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত। অবনীনাথ রায়: "জলধর সেন"। পৃ: ১১২-১৩।

১৩১. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। প্রফুল্লকুমার সরকার: "জলধর-স্মৃতি"। পৃ: ৯৭০।

১৩২. আবুল আহসান চৌধুরী: পূর্বোক্ত পৃ: ৬২।

১৩৩. 'জলধর সেনের আত্মজীবনী'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৭৪

১৩৪. ঐ; পৃ: ৭৫।

১৩৫. ঐ; পৃ: ৭৬।

১৩৬. ঐ; পৃ: ৭৯।

১৩৭. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ৯০৯।

১৩৮. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন: "জলধরদাদার দান"। পৃ: ৭৮।

১৩৯. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'। স্বপন মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থন সংস্করণ: কলিকাতা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২। পৃ: ৯১।
১৪০. জলধর সেন: 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড)। কলিকাতা, ১৩২০। পৃ: ৬১।
১৪১. 'ভারতবর্ষ': শ্রাবণ ১৩৪৩। জলধর সেন: "স্মৃতি-তর্পণ"। পৃ: ২৩৯।
১৪২. 'দাসী': জুন ১৮৯৬। জলধর সেন: "হরিনাথ মজুমদার"। পৃ: ৩১৪।
১৪৩. 'ভারতী': বৈশাখ ১৩২৩। জলধর সেন: "ভারতী-স্মৃতি"।
১৪৪. 'ভারতবর্ষ': জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। প্রফুল্লকুমার সরকার: "জলধর-স্মৃতি"। পৃ: ৯৬৯।
১৪৫. 'জলধর-কথা': পূর্বোক্ত। হেমন্তকুমার রায়: জলধর-পূজায় যৎ-কিঞ্চিৎ"। পৃ: ২২।
১৪৬. ঐ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: "খাঁটি বাঙ্গালী"। পৃ: ৩৬।
১৪৭. ঐ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়: "শ্রদ্ধাঞ্জলি"। পৃ: ৩২।
১৪৮. ঐ। বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ: "হিমালয়ের আড়ালে"। পৃ: ১৫৫।
১৪৯. ঐ। অনুরূপা দেবী: "শ্রীযুক্ত জলধর সেন"। পৃ: ১৫৮।
১৫০. ঐ। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত: "জলধর-কথা"। পৃ: ১৭২।
১৫১. দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'সেকালের স্মৃতি'। পূর্বোক্ত: পৃ: ৯৪-৯৫।
১৫২. ঐ; পৃ: ৯৫।
১৫৩. ঐ; পৃ: ৯৬।
১৫৪. ঐ; পৃ: ৯৬।
১৫৫. ঐ; পৃ: ৯৬।
১৫৬. হেমেন্দ্রকুমার রায়: 'যাঁদের দেখেছি'। দ্বিতীয় মুদ্রণ: কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৬১। পৃ: ১৬৩—৬৪।
১৫৭. 'বসুমতী': শ্রাবণ ১৩৪৩। দীনেন্দ্রকুমার রায়: "জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা" (২য় প্রস্তাব)। পৃ: ৫৫৩।
১৫৮. 'বসুমতী': ভাদ্র ১৩৪৩। ঐ: ৩য় প্রস্তাব। পৃ: ৮৯৫।
১৫৯. হেমেন্দ্রকুমার রায়: 'যাঁদের দেখেছি'। পূর্বোক্ত: পৃ: ১৬৪।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	কল্লোল যুগ। প-প্রকাশ : কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৭২।
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর। গ্রন্থন-স : কলিকাতা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২।
আবুল আহসান চৌধুরী	কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮।
কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (মোহিত রায় সম্পাদিত)	ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত। মঞ্জুষা-স: কলিকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬।
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য। কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।
জলধর সেন	কাঙ্গাল হরিনাথ (১ম খণ্ড)। কলিকাতা, ১৩২০।
	জলধর সেনের আত্মজীবনী। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬৩।
	জলধর-গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড)। কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২।
দীনেন্দ্রকুমার রায়	সেকালের স্মৃতি। কলিকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯৫।
নারায়ণ চৌধুরী	বরণীয় লেখক স্মরণীয় সৃষ্টি। কলিকাতা।
ব্রজমোহন দাশ (সম্পাদিত)	জলধর-কথা। কলিকাতা, ১৩৪১।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	জলধর সেন। দ্বি-স : কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৬৬।
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। কলিকাতা, ১৯৬২।
সাগরময় ঘোষ	সম্পাদকের বৈঠকে। তৃ-মুদ্রণ : কলিকাতা, কার্তিক ১৩৮৩।
সুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)। বর্দ্ধমান, ১৩৬৫।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী — আমাদের কালের কথা। দ্বি-স: চট্টগ্রাম, পৌষ ১৩৮২।

হেমেন্দ্রকুমার রায় — যাঁদের দেখেছি। দ্বি-মুদ্রণ: কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৬১।

পত্র-পত্রিকা

দাসী (কলিকাতা)	১৮৯৬।
প্রবাসী (কলিকাতা)	১৩১৯।
বসুমতী (কলিকাতা)	১৩৪০, ১৩৪৩।
ভারতী (কলিকাতা)	১৩০৮, ১৩২৩, ১৩৩০, ১৩৩৩।
ভারতবর্ষ (কলিকাতা)	১৩২১, ১৩৪১-৪৩, ১৩৪৬।
মানসী (কলিকাতা)	১৩২১।
লোকসাহিত্য পত্রিকা (কুষ্টিয়া)	১৯৮৪।
সাহিত্য (কলিকাতা)	১৩০৩।
সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কলিকাতা)	১৩৯৬।

কৃতজ্ঞতা

ডঃ সনৎকুমার মিত্র: অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।
মোহিত রায়: সাধারণ সম্পাদক, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, নদীয়া।
কাজল সেন: জামশেদপুর, বিহার।
ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায়: কলিকাতা।
অশোক উপাধ্যায়: কলিকাতা।
এম. আশরাফ-উল্ হক: কুষ্টিয়া।
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়: কৃষ্ণনগর, নদীয়া।